মায়ের নাম

শ্রীজলধর সেন

১লা শ্রাবণ, ১৩২৮

মূল্য ১৷৷৹ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
কালিকা প্রেস,
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্যের পরম হিতৈষী, দীনবন্ধু

শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও

লালগোলাধিপ বাহাদুরের

করকমলে
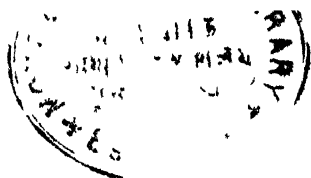
মায়ের নাম

১

বেশ ছিলাম—ত্রিশ টাকা বেতনে মহেশপুর ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক।

আমার বাড়ী নিশিগঞ্জ, মহেশপুর হইতে ৭ মাইল। শনিবার দুইটার সময় স্কুল বন্ধ হইলে বাড়ী যাইতাম, আবার সোমবার বাড়ী হইতেই আহারাদি করিয়া একবারে স্কুলে হাজির হইতাম, বাকী কয়টা দিন স্কুলের বোর্ডিংয়ে কাটাইয়া দিতাম। দরকার পড়িলে সপ্তাহের মধ্যে যে কোন দিনও বাড়ী যাইতাম।

বেতন ত্রিশ টাকা ছিল—'উপরি' প্রাপ্তিও কিছু ছিল। একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের স্কুলে পড়িত এবং বোর্ডিংয়েই থাকিত। আমি তাহার পড়া বলিয়া দিতাম, তাহার তত্ত্বাবধান করিতাম, —ছেলেটীর পিতা আমাকে মাসে দশটী টাকা দিতেন।

একরকম বাড়ীতে থাকিয়াই মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন—এল্-এ ফেল ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট; তাহার অধিক আশা করিতে গেলে মুরুব্বীর জোর চাই। আমার তাহা ছিল না,—নিজের কুলে ত নয়ই, শ্বশুরকুলে বা মাতামহ-কুলেও তেমন কেহ ছিলেন না,—সকলেই আমারই মত গরিব;—আমারই মত কেহ বা স্কুলের মাষ্টার, কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা সামান্য কেরাণী।

আমার সংসারও বড় ছিল না ;—আমার মা, আমার স্ত্রী, আর আমি, এই তিনজন মাত্র। তারপর স্বর্গীয় পিতাঠাকুর যে সামান্য কয়েক বিঘা জমি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে নিতান্ত অজন্মা হইলেও সংবৎসরের চা'ল ডা'লের ভাবনা ভাবিতে হইত না। সুজন্মার বৎসরে যে ধান পাইতাম, সংসার-খরচ বাদে তাহা হইতে যাহা বাঁচিত, তাহা গোলায় তুলিয়া রাখিতাম,—বাবার নিষেধ ছিল, কখন যেন ধান বিক্রয় না করি।

এখন, আপনারা দশজনে বলুন ত, এই অবস্থায় আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল কি না? এক, বলিতে পারেন, ভবিষ্যতে ত সংসারে লোক বাড়িতে পারে—পুত্র-কন্যা হইতে পারে। আমার সে আশা নাই ;—আমার বয়স বত্রিশ, আমার স্ত্রীর বয়স ছাব্বিশ! এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যখন আমরা সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না, তখন এ বংশ রক্ষার আর সম্ভাবনা নাই,—আমি শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুই এ বংশের শেষ প্রদীপ ;— এই প্রদীপ নিবিয়া গেলেই নিশিগঞ্জের স্বর্গীয় পিতৃদেব রামধন বসুর বংশ-লোপ। ভবিষ্যতে স্কুল মাষ্টারী করিবার জন্য এ-বংশে আর কেহই থাকিবে না। কি দুর্ভাগ্য!

কথাটা আবার জিজ্ঞাসা করি, মোটামুটি কিছুরই অভাব ছিল না, ভবিষ্যতে পরিবার বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা ছিল না, হঠাৎ কোন বিপদ আপদ কি ব্যাধি পীড়া হইলে যাহা ব্যয় হইতে পারে, সে জন্য মাষ্টারীর এই বেতন হইতেও, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ছয় শত টাকা ডাকঘরে সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা ছিল এবং মাসে মাসে পাঁচ সাত টাকা জমা হইতেছে ;—এ অবস্থাতেও কেন আমার অধিক উপার্জ্জনের লোভ হইল? মনস্তত্ত্বের এই কথাটা কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন?

এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই যে অতৃপ্তি, এই যে কি জানি কি—অর্থাৎ এই যে সয়তান, এ-ই মানুষকে সুখে থাকিতে দেয় না, শান্তিতে বাস করিতে দেয় না। তাহার ফলে মানুষের কি দুর্গতি হয়, কি বিপদ হয়, কি সর্ব্বনাশ হয়, অথবা যাহার অদৃষ্টের জোর আছে, তাহার [illegible]নাশের সূচনা মাত্র হইয়াই কিরূপে তাহার চৈতন্যোদয় হয়,—সেই কঠোর অভিজ্ঞতার কথাই আজ লিপিবদ্ধ কবিব। এই হতভাগ্যের জীবনে সেই অতৃপ্ত সয়তানের খেলা দেখিতে পাইবেন।

২

মহেশপুর স্কুলের যিনি সেক্রটারী, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিহর চট্টোপাধ্যায়। বড় জমিদার, আয় লাখ টাকার উপর। পাড়াগাঁয়ে লাখ টাকা আয়ের জমিদার রাজার হালে থাকে। হরিহর বাবুর খুব নামডাক; প্রতাপও কম নয়;—তবে এখন এই সুশাসিত ইংরাজের মুল্লুকে তাঁহার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় না;—জমিদারদের আর সে দিন নাই—পিনাল কোড সব সমান করিয়া দিয়াছে। তবে টাকার কল্যাণে জমিদার মহাশয়েরা এখনও পল্লীগ্রামে একটু-আদটুকু বাদশাগিরি করিয়া থাকেন, আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ও করেন,—তাঁহার কর্ম্মচারারাও কিঞ্চিৎ মেজাজ দেখাইয়া থাকেন; তাহাতেই গরিব প্রজাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

আমাদের হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত মহাশয়েরা হরিহর বাবুর যথেষ্ট মন যোগাইয়া চলেন,—প্রতিদিন জমিদার মহাশয়ের খাস দরবারে হাজিরা দেন: একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ, আর এক জন কাব্য, দর্শন ও বেদান্ত এই ত্রি-তীর্থ; তাঁহারা বে[illegible]জমিদার বাবুর

খোসামোদী করেন, এমন কথা থার্ড মাষ্টার হইয়া কেমন করিয়া বলিব ? আমি কিন্তু ঐটি পারিতাম না—কোন প্রয়োজনও বোধ করিতাম না—মহেশপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের বেতন ত্রিশ টাকার একপয়সাও বেশী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে আর কেন হাজিরা দিয়া মরি ?

হরিহর বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ—অনুগত ব্যক্তিরা বলেন চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। এত কম যাঁহার বয়স, এবং লাখ টাকা যাঁহার জমিদারীর আয়, তাঁহার প্রথমা পত্নীর ৺গঙ্গালাভ হইলে এই বছর দুই পূর্ব্বে যে তিনি একটী ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিন্দার কথা মোটেই নাই,—তা থাকুক না প্রথম পক্ষের একটা পুত্র, হউক না তাহার বয়স এগার বৎসর। তবে গত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার শরীর একেবারে 'ব্যাধিমন্দিরম্', হইয়াছিল—এই যা কথা ; আর তাঁহার চেহারটাও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি বড়মানুষের বিবাহ বন্ধ থাকে ? এই বিষম কন্যাদায়ের দিনে, হরিহর বাবুর মত রোগে জীর্ণ, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বড়মানুষের হাতে সুন্দরী, ষোড়শী কন্যাকে বলি দিবার লোক বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট—বহুৎ আছে। তুমি নবীন যুবক 'হরিবোল' (horrible) বলিলে চলিবে কেন ?

সে কথা থাকুক। একদিন স্কুল হইতে আসিয়া বোর্ডিংয়ে বসিয়া আছি, এমন সময়ে শুনিলাম হরিহর বাবুর পুত্র অনিলকুমারের যিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁহার সেই দিনই চাকুরী গিয়াছে এবং সেই দিনই তাঁহাকে মহেশপুর ত্যাগ করিয়া যাওয়ার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় ভদ্রলোক কাহারও সহিত দেখা করিয়াও যাইতে পারেন নাই ; এমন অকস্মাৎ, কি অপরাধে তাঁহার পাঁচ বৎসরের চাকুরীটি গেল, তাহাও বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

এ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইল,—নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল; সে সকল জনরব আর বলিয়া কাজ নাই। বড়মানুষের ঘরের কথা, আমরা সামান্য লোক কেমন করিয়া জানিব; এবং যে সমস্ত জনরব প্রচারিত হইল, তাহার সত্য-মিথ্যাই বা কেমন করিয়া নির্ণয় করিব।

তাহার পরই বোর্ডিংয়ের কোন কোন ছাত্র আসিয়া বলিল যে, এইবার হেডমাষ্টার মহাশয়ের অদৃষ্ট খুলিল, তিনিই না কি ১২৫৲ টাকা বেতনে অনিলকুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

আর একজন সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, অন্য ব্যবস্থা হইবে, হেডমাষ্টার সকালে ও রাত্রে পড়াইয়া আসিবেন; তাহার জন্য ৫০৲ টাকা পাইবেন, আর পণ্ডিত মহাশয় বিকালে পড়াইবেন, ৩০৲ টাকা পাইবেন, বাড়ীতে আর মাষ্টার রাখা হইবে না। এই রকম কত কথাই যে শুনিতে লাগিলাম, তাহা আর কি বলিব।

৩

সন্ধ্যার পর জমিদার-বাড়ী হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, হুজুর আমাকে তলব করিয়াছেন; এখনই যাইতে হইবে।

এই অসময়ে আমার তলব কেন? হয় ত ভৃত্য ভুল করিয়াছে, এই মনে করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "না, আপনাকেই এখনই ডাকিয়া লইয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে।"

আমি ত অবাক্। আমার তলব! এত দিনের মাষ্টারীটা থাকিবে না কি? কি জানি, অদৃষ্টে কি আছে!

দরবারে আর কে কে আছেন, জিজ্ঞাসা করায় ভৃত্য বলিব, "হুজুর দরবার-ঘরে বসেন নাই, তিনি শয়ন-ঘরে আছেন। শরীর ভাল নাই, তাই যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। একেলাই আছেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম! একেবারে শয়ন-গৃহে আমার তলব! অসুস্থ শরীরে আর কাহারও সহিত দেখা করেন নাই, বাছিয়া বাছিয়া লোক পাইলেন এই অশ্বিনীকুমার বসু!

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। জমিদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ভৃত্যটী আমাকে একটা ঘরে বসাইয়া হরিহর বাবুকে সংবাদ দিতে গেল; এবং একটু পরেই আসিয়া আমাকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিল। হরিহর বাবুর বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু আজ আমাকে যে দিকে যাইতে হইল, সে দিকে কোন দিন যাই নাই; সেটী অন্দর মহল কি বাহির মহল, তাহাও জানি না।

দুই তিনটী ঘর পার হইয়া আমরা একটী ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সে ঘরের দ্বার বন্ধ ছিল না, সম্মুখে একটা পর্দ্দা ছিল। পর্দ্দার বাহির হইতেই ভৃত্য বলিল, "হুজুর, মাষ্টার বাবু এসেছেন।"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "ভিতরে আস্‌তে বল।" সেটী শয়নঘর কি বসিবার ঘর, বুঝিতে না পারিয়া আমি আমার ছিন্ন-পাদুকা বাহিরে রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, একখানি পালঙ্কের উপর হরিহর বাবু শয়ন করিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "এস অশ্বিনী, ভাল আছ ত?"

আমি পালঙ্কের নিকট যাইয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে ভাল আছি। আপনার শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে?"

হরিহর বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে এই দিকে এসে বোসো।"

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "আমি নীচেই বসি।"

তিনি বলিলেন, "না, না, আমার শিয়রের কাছে চেয়ার টেনে বোসো। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।" আমার সঙ্গে বিশেষ কথা! ব্যাপার কি?

আমি তখন একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া হরিহর বাবুর শিয়রের নিকট বসিলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ অশ্বিনী, আমি খোকার মাষ্টারকে বিদায় করে দিয়েছি। লোকটা লেখাপড়ায় বেশ ছিল, কিন্তু এদানিক তার যেন স্বভাবটা কেমন বোধ হচ্ছিল। বল্তে গেলে এক রকম অন্দরেই থাক্‌তে হয়, আর ছেলের মাষ্টার; তার উপর কোন রকম সন্দেহ হ'লে তাকে কি আর রাখা যায়। কি বল?"

আমি ধীরভাবে বলিলাম, "সে ত ঠিক কথাই।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তেমন কিছু নয়। এই আমার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ থেকে যে ঝিটাকে এনেছি, মাষ্টারটা তার সঙ্গে তামাসা করত। আমার স্ত্রী তাই দেখে কা'ল আমাকে বল্‌লেন এবং মাষ্টারকে বিদায় করে দিতে বল্‌লেন। ঠিক কথাই ত! কি বল অশ্বিনী!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর হরিহর বাবু বলিলেন, "দেখ, তুমি যদিও সর্ব্বদা আমার এখানে এস না, তবুও তোমার উপর আমার দৃষ্টি বরাবরই আছে। তোমার ঐ হেড্‌মাষ্টারই বল, আর সেকেন মাষ্টারই বল, আর পণ্ডিত মশাই-ই বল, সব খোসামুদের দল।

তাই যদি না বুঝব, তা হ'লে এত বড জমিদারীটা চালাই কি করে? কি বল অশ্বিনী! তা দেখ, বি এ এম-এ-ই হোক, আর বিদ্যাভূষণ তর্কালঙ্কারই হোক—একই স্বভাব। আর—আর লেখা-পড়া—বিদ্যার কথা যদি বল, তা হলে তোমাকে বল্‌ছি, ও সব পাস-ফাস কর্‌লেই যে বেশী বিদ্যা হয়, তা আমি মানিনে। এই ধর না তুমি; তুমি এল-এ ফেল বটে, কিন্তু অনেক বি-একে পড়িয়ে দিতে পার। কি বল?"

আমি আর কি বলিব, আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ সূচনার উদ্দেশ্য কি? এত লোক থাকিতে তবে কি আমাকেই ছেলের মাষ্টার করা হইবে? সত্য কথা বলিতে কি, এ কথাটা ভাবিয়াও মনে আনন্দ হইল।

হরিহর বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা দেখ অশ্বিনী, আমি ভেবে দেখলাম, কোথা থেকে কোন্ অজানা অচেনা লোককে সুধু মার্কা দেখে আনব, তার চাইতে জানা চেনা লোককেই মাষ্টারীটা দিই। তাই তোমাকে ডেকেছি। ছেলের মায়েরও তাই ইচ্ছা। তোমায় বলব কি অশ্বিনী, আমার স্ত্রীর একেবারে ঐ ছেলে প্রাণ; কারো বলবার যো নেই যে ওঁর গর্ভজাত ছেলে নয়। যাক্ সে কথা। দেখ, তোমাকেই এ ভার নিতে হচ্চে, স্কুলে আর একজন মাষ্টার দেখে নেওয়া যাবে। তুমি ত স্কুলে ৩০৲ টাকা মাইনে পাচ্ছ; আমরা তোমাকে একেবারে তার ডবল ৬০৲ টাকা দেব। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, ধোবা নাপিত, সময় সময় কাপড়-চোপড়—সব আমাদের জিম্মা। কি বল অশ্বিনী?"

আমি বলিলাম, "আমি স্কুলে ৩০৲ টাকা পাই, আর একটা ছেলে পড়িয়ে দশটাকা পাই। তার পর—"

আমার কথায় বাধা দিয়া হরিহর বাবু বলিলেন, "মোটে কুড়িটাকা বাড়ছে বলে' তোমার আপত্তি ত। যাক্, সে মাষ্টারকে যে ৭৫৲ টাকা দিতাম, তোমাকেও তাই দেব। তারপর ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পার, চিরদিন এ সংসারেই কেটে যাবে। কি বল ?"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে কেউ নেই; আমাকে প্রতি শনিবারে বাড়ী যেতে হয়, আর সোমবারে আস্‌তে হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "সে একটা কথা বটে। তা তুমি একটু বোসো অশ্বিনী, আমি অন্দর থেকে আস্‌ছি, এখনই আস্‌ব।" এই বলিয়া হরিহর বাবু পালঙ্ক হইতে নামিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

৭৫৲ টাকা বেতন। কোন খরচপত্র নাই—৭৫৲টী টাকাই ঘরে যাইবে! এ কি কম প্রলোভন! হিসাব করিলে যে, অন্যস্থানের একশত টাকা বেতনের সমান! এ কি সামান্য কথা। আমি এল-এ ফেল —মহেশপুর স্কুলের থার্ড মাষ্টার—ত্রিশটাকা পাই, আর যে দশ টাকা পাই, সে আজ আছে কাল নাই। কোথায় ত্রিশ টাকা আর কোথায় নিখরচা ৭৫৲ টাকা। ইহার আর বিবেচনার কিছুই নাই—কিছু না! কত বি-এ এম্-এ এই চাকরীর খোঁজ পাইলে একরাশি সার্টিফিকেট আনিয়া ধরণা দিত; আর আমাকে ডাকিয়া আনিয়া চাকুরী—ইহারই নাম অদৃষ্ট!

আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম। হায় প্রলোভন, হায় শয়তান, এমনই করিয়াই মানুষ বিপন্ন হয়! ভগবান, আমাদের মত অমানুষকে যদি একটু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিতে প্রভু, তাহা হইলে, আর কিছু না হউক, অনেক লাঞ্ছনার হাত হইতে আমরা মুক্তি পাইতাম!

প্রায় দশ মিনিট পরে হরিহর বাবু ফিরিয়া আসিলেন; তিনি

বলিলেন, "দেখ অশ্বিনী, তোমাকে যখন এক রকম ঘরের ছেলের মতই থাক্‌তে হবে, তখন এ সব বিষয়ে গৃহিণীর পরামর্শ নেওয়াই দরকার। বিশেষ তাঁর বয়স কম হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে অশ্বিনী, তিনি যে পরামর্শ দেন, তেমন পরামর্শ খুব পাকা লোকও দিতে পারে না। তা দেখ, উনি বল্‌লেন যে, তোমার যখন বাড়ীতে কেউ নেই, আর জমাজমিটাও আছে, তখন তুমি শনিবারে শেষ বেলায় বাড়ী যেও; কিন্তু সোমবারে খুব ভোরে চ'লে এস, যেন সোমবারের সকালের পড়াটা কামাই না হয়; কোনও বার বা রবিবারের বিকালেই এলে। কেমন, এতে সম্মত ত? হেড্‌মাষ্টারের কথাও ভেবেছিলাম, কিন্তু উনি বল্‌লেন, ওসব লোক দিয়ে ছেলে পড়ান হয় না, ওরা স্কুলেই পড়াতে পারে। তুমি জানাশুনো লোক, বাড়ীতে একেবারে ছেলের মত থাক্‌বে; যখন যা অসুবিধা বোধ হবে, অন্দরে বলে পাঠালেই তখনই তা ঠিক হয়ে যাবে। কি বল?"

আমি বলিলাম, "আপনি পিতার তুল্য; আপনি যখন আদেশ কর্‌ছেন, তখন আমার আর আপত্তি কি! তবে বাড়ীতে মাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা দরকার।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তা বেশ ত; কা'ল সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ী যেও, আবার পরশু দিন এসেই একেবারে এখানে কাজে হাজির হবে।"

আমি বলিলাম, "মায়ের এতে আপত্তি হবে না; তবুও কোন কাজ করতে গেলে তাঁকে জানাতে হয়, তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আস্‌তে হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তা বটেই ত! আজ-কালকার দিনে এমন কথা কোন ছেলে বড় একটা বলে না। তোমার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট

হ'লাম অশ্বিনী! আর পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রীও সব কথা শুন্‌ছেন; তিনিও নিশ্চয়ই খুব খুসী হয়েছেন। তা তুমি এখন এস, অনেক রাত হয়ে গেল। ওরে তিনু, একটা লণ্ঠন নিয়ে মাষ্টার বাবুকে বোর্ডিংয়ে রেখে আয়গে ত! আমি তা হ'লে ভিতরে যাই।"

এই বলিয়া হরিহর বাবু পাশের ঘরে গেলেন এবং তখনই বাহির হইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যেও না অশ্বিনী, একটু বোসো। এই দেখ ত, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে এতক্ষণ বসে থাক্‌লে, এখন গিয়ে হয় ত ঠাণ্ডা ভাত খাবে। তাই উনি বল্‌লেন যে, তোমাকে একটু জল খাইয়ে দিতে। দেখেছ অশ্বিনী, ওঁর কেমন বুদ্ধি-বিবেচনা! কথাটা আমার মোটেই মনে হয় নি।"—তিনি যেন খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।

আমি বলিলাম, "জল খাওয়ার দরকার হবে না। আপনাদেরই ত খাচ্চি; এর পরে ত দিনরাত্রিই আছি। রাতও বেশী হয় নি, বোধ হয় ন'টা; আমাদের ন'টার পরই খাওয়া হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "আরে তা কি হয়! দেরী হবে না। উনি পূর্ব্বেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন; আমারই মাথায় আসে নি, হাঃ হাঃ হাঃ।"

কি করি, জল খাইতে হইল। পাশের ঘর হইতে গৃহিণী যে দেখিতেছেন, তাহা অলঙ্কারের ধ্বনিতেই বুঝিতে পারিলাম।

বোর্ডিংয়ে চলিয়া আসিলাম। অতি-ভক্তি যে চোরের লক্ষণ, ৭৫৲ টাকার প্রলোভনে তখন সে কথা ভুলিয়া গেলাম।

পথে আসিতে-আসিতে নিজের সৌভাগ্যে গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম; আর মনে হইতে লাগিল, হরিহর বাবুর কথা;—বৃদ্ধস্য

তরুণী ভার্য্যা যে কি. তাহাই ভাবিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার দিক হইতেও যে কথাটা ভাবা দরকার, তাহা ঐ ৭৫৲ টাকা আমাকে ভুলাইয়া দিল।

৪

যথাসময়ে নূতন চাকরীতে উপস্থিত হইলাম। অনিল ছেলে ভাল, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, কারণ সে স্কুলে পড়ে। এবার তাহার পঞ্চম শ্রেণী; পড়াশুনায় খুব মনোযোগ; বড়-মানুষের ছেলেদের যে সব দোষ থাকে, অনিলের তাহা কিছুই নাই। সুতরাং তাহার পড়াশুনার জন্য আমাকে কোন বেগই পাইতে হইল না। আমাকে শিক্ষক রূপে পাইয়া সে খুবই আনন্দিত হইল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

পাঁচ সাত দিন বেশ কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন যখন অনিল স্কুলে গিয়াছে, আমি কি একখানি বই পড়িতেছি, সেই সময় একটী দাসী একখানি কাগজে জড়ান কি হাতে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। এ কয়দিন কিন্তু কোন ঝি-দাসী আমাদের দিকে আসে নাই। অনিলের পড়ার ও আমার থাকিবার জন্য যে কয়েকটি ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অন্দরের সংলগ্ন হইলেও, অন্দরের দাসীরা কেহ আমাদের দিকে আসিত না, আসিবার প্রয়োজনও ছিল না।

দাসীকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "এখানে কি চাই?"

দাসী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "মা আপনার জন্য এই কাপড় পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি বলিলাম "আমার ত কাপড় আছে; যখন অভাব হবে,

তখন আমিই কিনে নেব। তুমি কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমার দরকার নেই।”

দাসী বলিল, “মা বলেছেন, আপনি যে কাপড় জামা ব্যবহার করেন, তাতে খোকা বাবুর মাষ্টারের মানায় না; কাপড়-চোপড় একটু ভাল চাই। তাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি না নিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হবেন।”

গৃহিণী যে আমার প্রকৃত মনিব, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; বলিলাম, “তা হলে ঐ টেবিলের উপর রেখে যাও। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বোলো, আমার এ সব কিছুরই দরকার নেই।”

দাসী হাসিয়া বলিল, “আপনার দরকার কি, তা তিনি আপনার চাইতে বেশী বোঝেন। আপনার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন”—বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

দাসীর কথা কয়টি আমার ভাল লাগিল না; কাপড় দেওয়াও আমি ঠিক মনে করিলাম না। আমি ছেলের মাষ্টার, মাষ্টারী করিব; সরকারের যে রকম ব্যবস্থা আছে, তাহাই আমার উপর প্রযুক্ত হইবে। আমার অসুবিধার জন্য এত বড় জমিদারের গৃহিণীর এ প্রকার আগ্রহের ত কোনই প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। তবে পূর্ব্বের মাষ্টারের হঠাৎ বিদায় দান সম্বন্ধে বাহিরের কু-লোকে যে কটাক্ষ করিয়াছিল, তাহার কি কিছু ভিত্তি আছে? ছিঃ, অমন কথা মনেও করিতে নাই। কর্ত্রী ঠাকুরাণী গরিবের ঘরের মেয়ে, গরিবের দুঃখ খুব বোঝেন; আমাকে দরিদ্র মনে করিয়া দয়া-পরবশ হইয়াই তিনি আমার সুবিধা--

অস্থবিধার খোঁজ লইয়াছেন এবং কাপড় পাঠাইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলা সম্বন্ধে এমন অন্যায় কথা, এমন পাপের কথা মনে করিলেও অধর্ম্ম হয়। মনকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলাম ; কিন্তু—!

৫

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার সেই দাসী আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল "মাষ্টার মশাই, মা জান্‌তে পাঠালেন, আপনার ত কোন অস্থবিধা হচ্চে না ?"

আমি বলিলাম, "কিচ্ছু না। তাঁকে বোলো, আমি গরিব মানুষ, এখানে রাজার হালে আছি ; আমার কোন অস্থবিধাই নেই।"

ঝি হাসিয়া বলিল, "আমিও ত সেই কথাই বলি। তিনি কি তা শোনেন ! তিনি সাবা দুপুর স্থধুই বলেন 'যা দেখে আয় মাষ্টার কি কবছেন' 'যা শুনে আয় তাঁব ত অস্থবিধা হচ্চে না'। আমি কি আর সব বার আসি ? এদিক-ওদিক ঘুরে গিয়ে যা হয় একটা বলি। তা যা বলুন মাষ্টার মশাই, আপনার অদেষ্ট ভাল, মায়ের নজরে যখন পড়েছেন, তখন বুঝে চল্‌তে পারলে আপনাকে পায় কে ? কর্ত্তা ত মায়ের হাতের মধ্যে। আর বুড়া-মানুষের কি চোক আছে ? মা তাঁকে যে দিক ফেরাবেন, তিনি সেই দিকেই ফিরবেন। যাই, তিনি হয় ত ঐ জানালাব ধারেই বসে আছেন।"

ঝি চলিয়া গেল। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল ! তাহা হইলে যাহা কা'ল ভাবিয়াছি তাহা ত মিথ্যা নহে। এখন উপায় ! হায় আমার দুর্ভাগ্য ! ৭৫ টাকার লোভে এ কি করিলাম ! যে দিন হরিহর বাবু আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দিনের সব কথা

আমার মনে হইল। সেই দিনই ত এ সকল কথা আমার বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু তখন উন্নতির আশায় আমি অন্ধ হইয়াছিলাম; সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা সম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা ত তখন আমার মনেই আসে নাই।. এই বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এমন কথা ত কখন শুনি নাই। বইয়ে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কল্পনা বলিয়াই মনে করিয়াছি। সত্য-সত্যই যে ভদ্র-মহিলা এমন হইতে পারে, তাহা আমি কোন দিনই ভাবি নাই। ছিঃ, এ সব কথা মনে করিলেও যে মন কলুষিত হয়! কিন্তু এখন উপায় কি?

আমি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, আমার মনের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। আমি উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি অন্দরের দিকে পড়িল। দেখিলাম অন্দরের দিকে একটা জানালার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিল। কি অনুপম রূপ, কি মোহিনী প্রতিমা! মানুষের যে এমন রূপ থাকে, সে রূপে যে এত মাধুর্য্য থাকে, তাহা ত আমি কোন দিন দেখি নাই। হাঁ, রূপ বটে! দেখিবার বস্তু বটে!

আমি তখন আত্মবিস্মৃত হইলাম; যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখান হইতে নড়িতে পারিলাম না। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ তিনি মুখ ফিরাইলেন,—চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। তাহার পরই একটু হাসিয়া, তিনি জানালার অন্তরালে গেলেন। আমার তখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। সরিয়া আসিয়া একখানি

চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই রূপই ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল.—হৃদয়ের মধ্যে সেই হাসিই দীপ্তি পাইতে লাগিল।

আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম! তাহার পর কত কথা ভাবিতে লাগিলাম, কত সুখের কথা—কত ভোগের কথা—কত মাথামুণ্ড! সে কথা আর প্রকাশ করিয়া কাজ নাই! এখন সে কথা বলিতেও যে আমার প্রাণ কেমন করে!

৬

সে রাত্রিতে আর খোকাকে পড়াইতে পারিলাম না—শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া অনাহারেই শয়ন করিলাম। খোকা বাড়ীব মধ্যে চলিয়া গেল।

আমার আর নিদ্রা নাই। কত কি ভাবিতে লাগিলাম, তাহা এত দিন পরে বলিতে পারিতেছি না।

রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন সেই দাসী চোরের মত ধীরে-ধীরে আমার শয়ন-ঘরে প্রবেশ কবিল এবং আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল. "মাষ্টার বাবু কি ঘুমুচ্ছেন?"

আমি মাথা তুলিয়া বলিলাম, "না, ঘুম হচ্ছে না। তুমি এত রাত্রে কেন?"

দাসী বালল, "আর এত রাত্রে! এখন বলুন, কিঁ করবেন? কা'ল সকালেই আমাকে খবর দিতে হবে।"

আমি বলিলাম, "কি করব?"

দাসী হাসিয়া বলিল, "কি আর করবেন! নিমন্ত্রণ নিলেন ত?"

আমি বলিলাম, "কৈ, কেউ ত আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি!"

দাসী রহস্য করিয়া বলিল, "চোখ দুটো তখন কোথায় ছিল ?"

আমি বলিলাম, "পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রণ না করিলে, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব না—এই কথা বোলো।"

দাসী বলিল, "বেশ, তাই হবে। কাল নিমন্ত্রণ-পত্র পাবেন।"

তখন কিন্তু নরকের পথে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নিমন্ত্রণ-পত্র চাহিয়াছিলাম—রূপের মোহে তখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ পত্রই আমাকে বাঁচাইযাছিল—আমার রক্ষাকবচ-স্বরূপ হইয়াছিল ।

ভালমন্দের দ্বন্দ্বেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল; কেহই পরাজয় স্বীকার করিল না; তবে সত্য বলিতে কি মন্দের প্রলোভনের জয়ই অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হইল।

পরদিন খোকা যখন স্নান-আহারের জন্য অন্তঃপুরে গিয়াছে, সেই অবকাশে দাসী আসিয়া 'নিমন্ত্রণ-পত্র' দিয়া গেল।

রঙীন সুদৃশ্য খামখানি হাতে পড়িতেই একটা সুবাস অনুভব করিলাম। পত্রখানি নাসিকার নিকট লইয়া আসিলাম, গন্ধে ভুরভুর করিতেছে;—এসেন্স-মিশান কালীতে লেখা।

পত্র খুলিলাম। অক্ষরগুলি সুছাঁদ—বানান-ভুলও বেশী নাই। পাঠ করিতে লাগিলাম,—কথাগুলি যেন অদেহিনী সুরা। আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া আমায় পাগল করিয়া, মাতাল করিয়া তুলিল—সুখের আবেশে আমি বিভোর হইয়া পড়িলাম।

পত্রখানির শেষাংশে পৌঁছিয়া, স্বাক্ষর নামটিতে দৃষ্টি পড়িবামাত্র আমার সে সুখের নেশা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া, আমার সমস্ত দেহ-মন অসীম লজ্জা ও প্রচণ্ড ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল।

পূর্ব্বে এই সয়তানীর নাম আমি জানিতাম না। দেখিলাম, সে নাম—যে নাম ইহজগতে আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, আমার চিরজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজার জিনিষ,—**আমার মায়ের নাম।**

পত্রের প্রতি শব্দ যেন তখন আমাকে প্রবলভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। কে যেন আমার হৃদয়ে অমিত বল সঞ্চার করিল—কে যেন আমার গন্তব্য পথ স্থির করিয়া দিল।

আমি তৎক্ষণাৎ জামা চাদর লইয়া একেবারে হরিহর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। আমার আর অপেক্ষা সহিল না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনাকে একটু উঠে আসতে হচ্চে; একটা বিশেষ কথা আছে।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া এবং আমার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অশ্বিনী, ব্যাপার কি ?"

আমি অতি নম্রস্বরে বলিলাম, "আমি বাড়ী চল্লাম ; চাকরি করব না, আর—মহেশপুরে আসব না।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "কেন, কেন, হয়েছে কি ?"

আমি বলিলাম, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

হরিহর বাবু বলিলেন, 'এমন হঠাৎ! কারণ কি হল শুন্তে পাইনে ?"

"আজ্ঞে না"—বলিয়া আমি সেই পাপপুরী পরিত্যাগ করিলাম।

নির্জ্জন পথে, পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পার্শ্বস্থিত একটা পচা ডোবায় ফেলিয়া দিলাম।

তাহার পর,—তাহার পর সেই জমিদার বাড়ীতে কি হইয়াছিল, সে কথা হিন্দুর ছেলের, সতী মায়ের পুত্রের বলিতে নাই।

—

মায়ের কোলে

১

আই-এ পরীক্ষা দিয়া নফর, দীর্ঘ অবকাশে পিতামাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত আনন্দে যাপন করিবার জন্য বাড়ী যাইয়া দেখে তাহাব পিতা জ্বরে শয্যাগত।

"মা, এতদিন বাবাব জ্বর, আমাকে খবর দেও নাই কেন?"

"উনি বারণ করেছিলেন, তোমাব পরীক্ষার ক্ষতি হবে, তাই খবর দিই নাই, আজ তের দিন জ্বব ছাড়ে না। ডাক্তার কত ওষুদ দিচ্ছে, কিছুতেই কিছু হচ্চে না; দিনেদিনেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন।"

নফর একটুও বিশ্রাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তারেব বাড়ী যাইবাব জন্য উঠিল।

মাতা বলিলেন, "উনি ঘুমুচ্ছেন, উঠুন, কেমন আছেন না আছেন, শুনে তার পর ডাক্তাবের কাছে যেও। এখন একটু বিশ্রাম কর।"

নফর সে কথা শুনিল না; সে তখনই ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইল।

ডাক্তার যাহা বলিলেন, তাহাতে নফর বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার জীবন-রক্ষার আর উপায় নাই—এ বয়সে ডবল নিউমোনিয়া হ'লে প্রায়ই রোগী বাঁচে না।

তাহাই হইল; নফরের বাড়ী পৌঁছিবার পরদিনই তাহার পিতা বিশ্বনাথ ঘোষ স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সত্যসত্যই অকূল সাগরে ভাসাইয়া

লোকান্তরে চলিয়া গেলেন; সনাতনপুর স্কুলের বাইশ বৎসরের হেড-পণ্ডিত মহাশয়, গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পরলোক গমনে সকলেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন;—আহা, এমন নির্ব্বিরোধ লোক এ অঞ্চলে ছিল না!

পণ্ডিত মহাশয়ের বেতন এই বাইশ বৎসরে আঠারো টাকা হইতে চব্বিশ টাকায় পৌছিয়াছিল। ইহাতেই এই কয়টি প্রাণীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত; তবে এই শেষ দুই বৎসর নফরের কলিকাতার পড়ার খরচ মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠাইতে হইয়াছে. বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের একটু বেশী টানাটানি পড়িয়াছিল; শুধু টানাটানি কেন, অনেক সময় বিশেষ অভাবই অনুভূত হইত।

কিন্তু তা বলিয়া ত নফরের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা যায় না। মেয়েটির জন্য পণ্ডিত মহাশয় মোটেই ভাবিতেন না; বলিতেন, "চপলা সবে দশ বছরে পড়েছে, ওর যখন বিয়ের সময় হবে, তখন নফর উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌বে; ওর বিয়ের ভাবনা নফর ভাব্‌বে।"

কিন্তু শুধু চপলার বিবাহের ভাবনা নহে, তাহারও অপেক্ষা অধিক গুরুতর ভাবনা উনিশ বৎসর বয়সের ছেলের উপর অর্পণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বভারহারীর কাছে চলিয়া গেলেন; নফর অন্ধকার দেখিল!

পণ্ডিত মহাশয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; থাকিবার মধ্যে সামান্য মেটে বাড়ীখানি। নফরের মাতা যখন তাঁহাদের কষ্টের কথা অনাটনের কথা, অনেক দিন একাহারের কথা তাহাকে এই প্রথম জানাইলেন, তখন নফর কাঁদিয়া আকুল হইল। সে ত এত কথা জানিত না। লেখাপড়া শিখিবার জন্য সে পিতামাতা ভগিনীকে এত

কষ্ট দিয়াছে; তাঁহারা একাহারে থাকিযা তাহার কলিকাতাব খরচ চালাইয়াছেন।

নরুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, এ কথা এত দিনেব মধ্যে আমাকে বল নাই কেন? আমি জানতাম বাবার হাতে কিছু টাকা আছে; তাই থেকে তিনি আমাকে মাসে দশ টাকা করে দিতেন। এ কথা জানলে আমি পড়তে যেতাম না মা। এত কষ্ট কবেই বাবাব শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল! আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ! এ কষ্ট, এ দুঃখ, মা, আমি জীবনে ভুলতে পারব না।"

মাতা পুত্রের মুখ মুছাইযা দিযা বলিলেন, "তিনি তাঁর কর্ত্তব্য করেছেন; ছেলেকে মানুষ করা, তাকে লেখাপড়া শিখান বাপমাযেব প্রধান কাজ। তা তিনি প্রাণপণে করেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন কি হবে?'

"কিসের কি হবে মা?"

"এই তোমার পড়ারই বা কি হবে, আর এই তিনটী প্রাণীবই বা কি হবে?'

"কেন? তুমি কি মনে কর মা, আমবা না খেয়ে মরব। কিছুতেই না। আমি লেখাপড়া শিখ্‌তে পারলাম না সত্য, কিন্তু আমি কাব ছেলে, তা ভুলে যাচ্চ কেন মা? কার বুকেব রক্তে আমি বেড়েছি, তা জান? তোমার শিবপূজা কি ব্যর্থ হবে? তুমি লেখাপড়া জান, মা, তুমি ভগবানে বিশ্বাস হারিও না। আমি মূর্খ হই আর যাই হই, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি তোমাদের ভরণপোষণ করতে পারব। তবে বাবার বড় ইচ্ছা ছিল আমাকে লেখাপড়া শেখান,—আমি সবগুলি পাশ করি। তা আর হোল না। কিন্তু লেখাপড়া শিখবো,

সংসারে উন্নতি কর্‌বো, বাবার মহান্ স্বার্থত্যাগের পুণ্যে আমার পথে কোনও বাধা-বিঘ্ন দাঁড়াতে পার্‌বে না, তা তুমি ঠিক জেনো।”

পুত্রের এই আশার বাণী—এই আত্ম-নির্ভরতা জননীর হৃদয়ে গভীর আশ্বাসের সঞ্চার করিল। তিনি নফরকে বুকের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন, —“বাবা, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। চিরজীবন এমনই করে ভগবানে বিশ্বাস রেখো—এমনই করে তোমার স্বর্গীয় জনকের কথা মনে রেখো। তোমার উন্নতি হবে।”

২

পিতার শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া নফর পরীক্ষার ফলের অপেক্ষা না করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষার ফল জানিবার তাহার আর কোনই প্রয়োজন নাই। পাশ হইলেও সে পড়িবে না, ফেল হইলেও সে পড়িবে না। পূজনীয়া মাতা ও স্নেহময়ী ভগিনীর ভরণপোষণ এখন হইতে তাহাকেই করিতে হইবে।

কলিকাতায় যে ভদ্রলোক দয়া করিয়া নফরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহার কলিকাতায় অবস্থানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নফরের পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। দুঃখ করিয়া বলিলেন, “নফর, পড়া-শুনার কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না কি। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, এবার তুমি পাশ হবে, আর যদি পড়তে পার, তবে তুমি সব কটি পরীক্ষাই উত্তীর্ণ হবে।”

নফর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তা আর হয় না, হতে পারে না। এখন আমার উপার্জ্জনের উপরেই আমার মা-বোনের ভরণ-পোষণ নির্ভর করছে। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করে আপনার কাছে

ফিরে এসেছি। আমি জানি আপনি আমার যেমন-তেমন একটা চাকরী জুটিয়ে দেবেনই।”

জীবন বাবু হাসিয়া বলিলেন, “আমার উপর তোমার এতটা নির্ভর।”

নফর কহিল, “আজ দু’বছর আপনাকে দেখে আস্‌ছি, আপনি আমাকে ফেল্‌তে পার্‌বেন না। কে যেন আমাকে বল্‌ছে, আপনাকে ধরেই আমার সব হবে।”

জীবন বাবু এই নবীন যুবকের এতখানি দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন, “বেশ, তাই হবে। আমি তোমায় বলছি নফর, যেমন করে হ’ক আমি তোমার একটা চাকরী করে দেবোই।”

দুই-তিন দিন পরেই তিনি একটি সওদাগরী আফিসে নফরের একটা চাকরী করিয়া দিলেন। বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা।

নফরকে এই সংবাদ দিয়া জীবন বাবু বলিলেন, “নফর, তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যতদিন তুমি এখানে থাক্‌বে, যতদিন তোমার মা-ভগিনীকে এখানে এনে স্বতন্ত্র বাসা কর্‌তে না পার্‌বে, তত-দিন তোমাকে এখানেই থাক্‌তে হবে। এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে করতেই হবে। তোমার মত ছেলের গায়ের বাতাসেও আমার বাড়ী পবিত্র হবে।”

নফর অশ্রুপূর্ণ নয়নে জীবন বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

৩

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল; নফর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া নফর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

জীবন বাবু এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন,—"দেখ নফর, তুমি চাকরী ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার পড়ার খরচ চালাব; আর তোমার বাড়ীব খরচ আমিই মাসে দশ টাকা করে দেব।"

জীবনবাবুর কথা শুনিয়া নফর কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারব না, কিন্তু আমি আর ও-পথে যাব না। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি পাশ না করিযাও আপনার আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া শিখ্‌তে পাবব।" জীবনবাবু আর অনুরোধ করিলেন না; যাহাতে নফরের চাকুবীর উন্নতি হয়, তাহাবই চেষ্টা তিনি করিতে লাগিলেন।

নফর পঁচিশ টাকা বেতন পায়, তাহার কুড়ি টাকাই সে প্রতি মাসে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, অবশিষ্ট পাঁচ টাকা নিজের কাছে রাখে।

চৈত্র মাসে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে; পূজার সময় বাড়ীতে যাইতে হইবে; সে সময় চপলা ও মায়ের জন্য কাপড় কিনিতে হইবে, চপলার জন্য আরও কত কি কিনিতে হইবে; তাই সে পাঁচ টাকার একটী পয়সাও নিজেব জন্য ব্যয় করিত না। প্রতিদিন পদব্রজে শ্যামবাজার হইতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অফিসে যাতায়াত করিত; ক্ষুধা পাইলে এক পয়সার কিছু কিনিয়াও সে খাইত না। তাহার মনে হইত, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাহার পিতা অর্দ্ধাশনে কত দিন কাটাইয়াছেন। সে মর্ম্মভেদী কথা কি সে ভুলিতে পারে?

প্রতি সপ্তাহে নফর মায়ের নিকট হইতে পত্র পায়; চপলাও তাহার সেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অক্ষরে, তাহার সেই দেব-ভাষায় দাদাকে পত্র লেখে। সে পত্রে বালিকা কত কথা লেখে; বাড়ী যাইবার সময় দাদা তাহার জন্য কি কি দ্রব্য লইয়া যাইবে, তাহার ফর্দ্দ পাঠায়। নফর প্রতি মাসেই

এটা-ওটা কিনিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল—পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইয়া চপলাকে দিবে। চপলা এই সকল দ্রব্য পাইয়া কত আনন্দ করিবে, তাহার মুখে কেমন হাসি ফুটিয়া উঠিবে, শ্যামবাজারের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া নফর চক্ষের সম্মুখে সেই মনোমোহন দৃশ্য দেখিতে থাকে, তাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

পূজার তিন চারি দিন পূর্ব্বে আফিসে নোটীস বাহির হইল যে, কাজের বড় ভিড়, এবার কর্ম্মচারীদিগকে মোটেই ছুটি দেওয়া হইবে না, বিজয়ার দিন মাত্র আফিসের কাজ বন্ধ থাকিবে। তবে সকল কর্ম্মচারীই পূজার খরচ বলিয়া এক মাসের বেতন অতিরিক্ত পাইবে।

এই সংবাদ পাইয়া নফর অধীর হইয়া উঠিল। পূজার সময় বাড়ী যাইতে পাইবে না; মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে না, চপলার হাসিমুখ দেখিতে পাইবে না। সে কি করিয়া রহিবে? সে যে এই কয়মাস ধরিয়া চপলার জন্য কত কি সংগ্রহ করিয়াছে, মায়ের জন্য কাপড় কিনিয়াছে, সংসারের জন্য কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য গোছাইয়াছে; বাড়ী যাইতে পাইবে না। হিন্দুর ছেলে—বিধবার সন্তান,—বিজয়ার দিন সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিতে পাইবে না। সে কি কথা?

নফর সামান্য কর্ম্মচারী; বড় সাহেবদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় না; তাহার মাথার উপর প্রায় কুড়ি জন বাবু।

নফর প্রথমেই তাহার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর কাছে গেল এবং ছুটীর প্রার্থনা করিল। বড়বাবু রাশভারি লোক, মেজাজও খুব উচু। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন "না হে বাবু, ছুটি মিল্‌বে না। আমি সাহেবকে বল্‌তে পারব না। তিন দিন মাত্র কাজে এসেছ, এরই

মধ্যে ছুটী। ও-সব হবে না, যাও। আগে চাকুরী, তারপর বাপ-মা।”

বড়বাবুর নিকট কোন আশাই নাই, দেখিয়া নফর মলিন মুখে চলিয়া আসিল। দুইদিন পর্য্যন্ত সে ভাবিল, কিন্তু কোন পথই সে পাইল না। চাকুরী ত্যাগ! সে কথা নফর মনেও আনিতে পারিল না; চাকরী ত্যাগ করিলে যে মা-বোনের অন্নাভাব। কিন্তু বাড়ীতে না গেলে মা যে বিজয়ার দিন চক্ষের জল ফেলিবেন, চপলা যে দাদাকে না দেখিয়া মলিন মুখে দিন কাটাইবে। নফর কাতর হৃদয়ে অফিস যাইতে লাগিল।

সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল,—নফর অফিসে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীতে কোন সংবাদ দিল না, জিনিষ-পত্রগুলি পাঠাইবারও লোক পাইল না।

নবমীর দিন পাঁচটার সময় আফিস বন্ধ হইলে নফর চিৎপুর রোড দিয়া শ্যামবাজারের দিকে আসিতেছিল, জোড়াসাঁকোর নিকট একটি বাড়ীতে পূজা দেখিবার জন্য অনেক লোক প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া নফর দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

একটু পরেই দেখিল, একটী বিধবা রমণী ছয় বৎসরের একটী মেয়েকে ঠাকুর দেখাইবার জন্য সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন। নফর দেখিল, মেয়েটি ঠিক তার ভগিনী চপলার মত,—তেমনই সুন্দর মুখ, তেমনই ভাব-ভঙ্গী। নফরের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল; সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

তাহার মনে হইল, এই মেয়েটি চপলার রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে;—আর ঐ অবগুণ্ঠনাবৃতা বিধবা রমণী যেন তাহারই জননী।

নফর বাসায় আসিয়া দেখিল জীবনবাবু নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে কোথায় গিয়াছেন। তখন আর তাহার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সে মনস্থির করিয়াছে। যা থাকে অদৃষ্টে—যায় চাকুরী যাইবে—সে এই সাড়ে-সাতটার ট্রেণে বাড়ী যাইবে। এ ট্রেণে গেলেও পরদিন অপরাহ্ণ চারিটার মধ্যে সে বাড়ী পৌছিতে পারিবে।

সে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাইয়া ফেলিল; আহার করিবার আর সময় ছিল না। অফিসের বড়বাবুর নামে একখানি চিঠি লিখিয়া রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। বড়বাবুকে সে অকপটে সমস্ত কথা লিখিয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে যখন সে গোয়ালন্দে নামিয়া ষ্টিমারে উঠিল, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

নফর বড়ই ভীত হইল,—মেঘ দেখিয়া নহে, যদি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ষ্টিমার হইতে নামিয়া পাঁচ ক্রোশ পথ সে কেমন করিয়া যাইবে;—বাড়ীর কাছেই আর একটা নদী পার হইতে হইবে।

বেলা একটার সময় নফর ষ্টিমার হইতে নামিল। ঘাটে মুটে মিলিল না, বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। সে তাহার বোচকা মাথায় করিয়া যাত্রা করিল; আকাশে তখনও খুব মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি আসে নাই। নফর দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল। পাঁচ ক্রোশ পথ—সে তিন ঘণ্টায় নিশ্চয়ই যাইতে পারিবে, তাহার পর নদী পার হইলেই ত তাহার বাড়ী।

ক্রোশ দুই পথ যাইবার পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মাঠের মধ্যে আ'লের উপর দিয়া পথ, তাহার পর এই বৃষ্টি। কিন্তু সে তাহার গতি সংযত করিল না; জুতা জামা চাদর তাহার বোচকায় বাঁধিয়া লইয়া সে

প্রাণপণ বেগে চলিতে লাগিল। সঙ্গে ছাতা ছিল না; সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেল; কাদায় দেহ বিভূষিত হইয়া গেল। কোন দিকেই দৃষ্টিপাত নাই!

যখন সে নদীতীরে উপস্থিত হইল, তখন ভয়ানক ঝড় উঠিয়া আসিল —যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি। বেলাও তখন প্রায় শেষ। সে মনে করিয়াছিল, তিন ঘণ্টায় বাড়ী পৌঁছিবে; কিন্তু বৃষ্টির জন্য সে প্রায় ছয়টার সময় নদীতীরে পৌঁছিল।

তাহার পর বিপদ,—খেয়া-নৌকা এ পারে নাই, ঝড়ের একটু পূর্ব্বে নৌকা ও-পারে গিয়াছে, আর ফিরিতে পারে নাই। পাটনীর ঘরে একটি ছেলে বসিয়া আছে, পাটনীরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

নফর পাটনীর সেই ঘরে আধঘণ্টা অপেক্ষা করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, ঝড় আর থামে না। নফর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সে আর অপেক্ষা করিতে ত পারে না। তাহার মায়ের মুখ তখন মনে পড়িল। সে ছেলেটিকে বলিল, "দেখ, আমার এই বোচকাটি তোমাদের এখানে রেখে যাই; কাল এসে নিয়ে যাব।"

ছেলেটি বলিল, "তুমি যাবে কোথায়?"

"পারে!"

"পারে!—খেয়া-নৌকা ত নেই। এ ঝড়ে কি করে যাবে?"

"আমি সাঁতার দিয়ে যাব ভাই! আমার মা যে আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।"

ছেলেটা হা করিয়া চাহিয়া রহিল।

নফর তখন পাগলের মত নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং একটুও শঙ্কা

না করিয়া 'মা, মা' বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল। তাহার পর সেই উন্মত্ত নদীতরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেই অন্ধকারে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

নফরের মাতা ও ভগিনী বিষণ্ণ মনে ঘরের দ্বারের সম্মুখে বসিয়া ছিল, এমন সময় কম্পিত-কলেবরে শ্রান্ত ক্লান্ত নফর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সমস্ত শক্তি কণ্ঠে কেন্দ্রীভূত করিয়া ডাকিল "মা।"

মাতা এই শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন;—নফর অতি কাতর স্বরে বলিল, "মা, বিজয়ার প্রণাম করতে—" সে আর কথা বলিতে পারিল না, **মায়ের কোলে** অবসন্ন হইয়া পড়িল।

উৎসর্গ

মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম সাহেব আমাদের গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড-মাষ্টার। তিনি আজ ২০ বৎসর ধরিয়া এই হেড-মাষ্টারীই করিতেছেন; যে কয়দিন শরীরে শক্তি থাকে, কাজ করিবার সামর্থ্য থাকে, এই হেড-মাষ্টারীই করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি যে সময় বি-এ পাশ করিয়াছিলেন, তখন একটু চেষ্টা করিলে, দুই চারিখানি সুপারিশ সংগ্রহ করিয়া, অনায়াসেই ডিপুটীগিরি লাভ করিতে পারিতেন; বড় একটা চাকুরী যে পাইতেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু, ভগবান তাঁহাকে সে মতি দেন নাই। আমরা সে কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "আমি গরিবের ছেলে, অনেক কষ্টে সামান্য একটু লেখাপড়া শিখিয়াছি; এ শিক্ষা যদি নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্যই নিযুক্ত করি, তাহা হইলে আর কি হইল। আমি আমার গ্রামের ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্যই জীবনপাত করিব। আমার জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য।"

যাঁহার জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য, তিনি যে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমি তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি; তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আই-এ পাশ করিয়া এখন বি,এ পড়িতেছি। তাঁহার কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না, এখনও নাই; তিনি পুত্রাধিক স্নেহে সকল ছাত্রেরই

উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। এমন শিক্ষক লাভ করা বিশেষ সৌভাগ্যেব কথা।

শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেকবার তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রাম ছাড়িযা, গ্রামের শিক্ষকতা ত্যাগ করিযা কোথাও যাইতে সম্মত হন নাই। আমাদের স্কুলে যখন তিনি প্রথম কর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাব বেতন হইয়াছিল ৬০৲ টাকা, এখন তিনি ৮০৲ টাকা পান। ভদ্রলোক ইহাতেই সন্তুষ্ট। কলিকালে এমন নিস্পৃহ মানুষ হিন্দু-মুসলমান কাহাবও মধ্যে দেখিয়াছি বলিযা মনে পড়ে না। দুই একজন থাকিলেও তাঁহাদেব সন্ধান কে বাখে? তাঁহাদেব স্বার্থত্যাগেব পবিচয় কয়জন জানে?

মৌলবী সাহেবের পরিবারেও বেশী লোক ছিল না, তিনি, তাঁহাব সহধর্ম্মিণী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র মহম্মদ আলিমদ্দীন আমার সহপাঠী। আমরা এক সঙ্গে ক, খ, পড়িতে আরম্ভ কবি, একসঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায উত্তীর্ণ হই। আমরা দুইজনই প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছিলাম; আমি বৃত্তি পাই নাই, আলি বৃত্তি পাইয়াছিল। এ বৃত্তি মুসলমানদিগেব জন্য বিশেষ নহে, প্রতিযোগিতাব বৃত্তি।

আমি হিন্দুর ছেলে, আর আলি মুসলমানেব ছেলে; কিন্তু আমরা একদিনও এ প্রভেদেব কথা ভাবি নাই, মাষ্টার মহাশয় আমাদের দুইজনকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্ম পৃথক ছিল বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয এক ছিল। মাষ্টাব মহাশয় বাল্যকাল হইতেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন "খোদা ও ঈশ্বরে প্রভেদ নাই। যার যে নামে রুচি, সেই নামে ডাকিলেই তিনি সাড়া দেন।" আমরা

তাঁহার এই উপদেশ গুরুমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি আর একটা কথা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "'বিশ্বাসে পাইবে বস্তু, তর্কে বহুদূর।' তোমরা ধর্ম্ম লইয়া তর্ক করিও না। আমি তর্কের বিরোধী। আমি সংস্কারের পক্ষপাতী। তোমার-আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহ যে ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর কিছুতেই আস্থাশূন্য হইও না। হিন্দুর ছেলে হিন্দু-শাস্ত্রের আদেশ পালন করিও। কখনও মনে সংশয় আনিও না। ইহাকে যিনি গোঁড়ামি বলিতে চান, বলুন, তোমরা তাহাতে কর্ণপাত করিও না। আমি এ কথা খুব মানি—স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ। বাপ পিতামহের ধর্ম্মত্যাগ করিও না—কিছুতেই না।" আমাদের শিক্ষাগুরুর এ উপদেশ আমরা—অন্ততঃ আমি ও আলি গ্রহণ করিয়াছিলাম; তাই আমরা দুইজন এখনও ভাই-ভাই আছি।

আমার শিক্ষাগুরু মৌলবী সাহেবের গুণ বর্ণনা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করি নাই, অন্য একটা কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে শিক্ষক মহাশয়ের পরিচয় দিবার জন্যই এই কয়েকটি কথা বলিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৌলবী সাহেবের একটি পুত্র আলিমদ্দিন, আর একটি কন্যা। কন্যাটি আলির কনিষ্ঠা, তাহার নাম লয়লা, আমরা তাহাকে 'লিলি বেগম' বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের দেখাদেখি আর সকলে, এমন কি মৌলবী সাহেব পর্য্যন্তও তাহাকে লিলি বলিয়া ডাকিতেন। 'লিলি বেগম' আলির পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল।

মৌলবী সাহেব ছেলে ও মেয়েকে সমানভাবে দেখিতেন। প্রতি-দিন তিনি যেমন ছেলেকে পড়াইতেন, মেয়েকেও তেমনই পাঠ দিতেন।

ছেলে স্কুলের পড়া পড়িত, মেয়েকেও তিনি ঠিক স্কুলের পড়ার মত ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত পড়াইতেন। ছেলেকে যেমন উর্দ্দূ শিক্ষা দিতেন, মেয়েকেও তেমনই উর্দ্দূ শিখাইতেন।

আলি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল, তখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর, লয়লা তখন ১২ বৎসরে পড়িয়াছে। কিন্তু এই বার বৎসর বয়সের মেয়ে পিতার শিক্ষাগুণে তখনই প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতাম, ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সে আমাদের অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল; ইহা ছাড়া উর্দ্দূ সে কতটা শিখিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারিব না; কিন্তু মৌলবী সাহেব বলিতেন যে, লয়লা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বেশ বুঝিতে পারে।

আমরা কলিকাতায় পড়িতে গেলাম; মৌলবী সাহেব তখন একমাত্র কন্যার শিক্ষা-বিধানের জন্য অধিকতর যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কিন্তু যখন-তখনই বলিতেন "মেয়েকে যে এত লেখা-পড়া শিখাইতেছ, তাহার পর।"

মৌলবী সাহেব বলিতেন "তাহার পর কি ?"

গৃহিণী বলিতেন "এত লেখাপড়া-জানা মেয়ের উপযুক্ত জামাই কোথায় পাইবে ?"

মৌলবী সাহেব বলিতেন "সে যা হয় হইবে; তা বলিয়া কি মেয়ের জ্ঞানসঞ্চয়ে বাধা দিতে পারি। খোদার যা মর্জ্জি হয়, তাহাই হইবে। তুমি আমি কি কর্ত্তা!"

মৌলবী সাহেবের সহধর্ম্মিণী এ কথার আর কি উত্তর দিবেন। স্বামীকে তিনি দেবতা বলিয়াই জানিতেন। তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহা ভালই হইবে। তবুও স্ত্রীলোকের মনবোঝে না, পাড়ার

দশজনেও ঐ কথা বলে; তাই তিনি স্বামীকে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

লয়লা যখন ১৪ বৎসরে পড়িল, তখন মৌলবী সাহেবের আত্মীয়-স্বজন সকলেই মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। মৌলবী সাহেবের শ্বশুর-মহাশয় তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন; কারণ তিনি তাঁহার জামাতাকে নিতান্ত না-লায়েক, অপদার্থ, বিষয়-বুদ্ধিহীন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যিনি ইচ্ছা করিলে এতদিনে বড় একটা ডিপুটী হাকিম হইতে পারিতেন, একটা খাঁ-বাহাদুর খেতাব পাইতে পারিতেন, বাড়ীতে কোঠা-বালাখানা করিতে পারিতেন, দাস-দাসীতে গৃহ পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন, তিনি কি না পাড়াগাঁয়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়াই জীবনপাত করিলেন, বাড়ীতে একখানি ইটও বসাইতে পারিলেন না; নিতান্ত গরিবের মতই রহিলেন; দশজনে চিনিলও না, মানিলও না। এমন লোক কি পুরুষ বাচ্চা! শ্বশুর জামাইকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতেন না। তাঁহার নিজের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না! জামাইয়ের হাতে যে টাকাকড়ি বিশেষ নাই, তাহাও তিনি জানিতেন। আশি টাকা বেতন; তাহার মধ্যে হইতে ছেলেকে মাসে দশ পনর টাকা পাঠাইতে হয়। আর যাহা থাকে, তাহাতে সংসার-খরচই চলিবে, না মাসে-মাসে কেতাব কেনাই হইবে। মৌলবী সাহেব স্ত্রী বা কন্যার গায়ে একখানি অলঙ্কারও দেন নাই; কেহ সে কথা বলিলে তাঁহার পুস্তকরাশি দেখাইয়া বলিতেন—"এদের চাইতে সেরা জহরৎ নবাব সাহেবের তোষাখানাতেও নেই।"

এ হেন বিষয়-বুদ্ধিহীন, না-লায়েক জামাইয়ের উপর কি আর নির্ভর

করা চলে ? তিনি আলিকে লয়লার বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিলেন। ছেলেও বাপেরই মত। আলি আমাদের মেসে আসিয়া সেই পত্র আমাকে দেখাইল এবং তাহার কি উত্তর দিতে হইবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম "তুমি কি বল ?"

সে বলিল "আমি বলি, এ সম্বন্ধে বাবা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তবে এক কথা এই যে, কোন মূর্খের হাতে লয়লাকে দেওয়া হইবে না।"

আমি বলিলাম "সেই ভাল কথা ; তাহাই লিখিয়া দেও।"

আলি আমার পরামর্শ-মত তাহাই লিখিল ; অধিকন্তু, এ কথাও লিখিল যে, আর মাসখানেক পরেই তাহার পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে. সে যথেষ্ট অবসর পাইবে ; সেই সময় সেও ভাল বর অনুসন্ধানের সহায়তা করিতে পারিবে , ইতিমধ্যে তাঁহারাও যেন নিশ্চেষ্ট না থাকেন। আলি তাহার পিতাকেও এই মর্ম্মে পৃথক পত্র লিখিল।

মৌলবী সাহেবের শ্বশুর-মহাশয় ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ ভাল ছেলের সন্ধানের ক্রটী করিলেন না ; কিন্তু তাঁহারা যে সকল ছেলেকে ভাল বলিয়া উপস্থিত করিলেন, তাহার একটীও মৌলবী সাহেবের পছন্দ হইল না। একজন আত্মীয় একটি ছেলের সম্বন্ধ লইয়া আসিলেন ; তিনি মৌলবী সাহেবকে বলিলেন "এমন ছেলে জামাইরূপে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ছেলেটী ইংরাজী জানে, উর্দ্দু জানে, বাপের বেশ বিষয়-আশয় আছে ; চা'লচলনও ভাল ; বেশ বনিয়াদি ঘর। তারা কি সাদি দিতে চায় ? আমি অনেক বলিয়া-কহিয়া তাহাদের সম্মত করিয়াছি। তা' যাই বল ইব্রাহিম ভাই, তুমি লেখাপড়াই শিখিয়াছ, কিন্তু কাজে ত কিছু করিলে না ; তোমার অবস্থাও ভাল নয়। বড়-

ঘরাণা ছেলে তোমার মেয়েকে সাদি করিবে কেন? লেখাপড়ার কথা বলছ; তা মেয়েদের 'লেখাপড়ার দরকার কি? জেনানার মধ্যে লেখাপড়া শিখেও যা, না শিখেও তাই। কি বল?"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "ছেলেটী কতদূর পড়াশুনা করেছিল?"

আত্মীয় বলিলেন "সে ঢাকা মাদ্রাসার ফোর্থ কেলাশ পর্য্যন্ত পড়েছিল। তার পর তার বাবা বললেন, 'ঐ যথেষ্ট, আর পড়িয়া কাজ নাই। যা বিষয় আশয় আছে, তাই দেখেশুনে চল্‌তে পার্‌লে আমীরের মত দিন গুজরাণ হবে।' তাই ছেলেটি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। এখন বাড়ীতেই থাকে, কাজকর্ম্ম দেখে-শোনে। শোন ইব্রাহিম ভাই, ছেলেটা খুব চৌকশ; আদব-কায়দা খুব দোরস্ত। দেখ্‌লে আমীর-ওমরাহের ঘরের ছেলে ব'লেই মনে হবে। ছেলের বাপও গাঁয়ের পঞ্চায়েত। দারোগা বাবু না কি বলেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে অনাহারী মেজেষ্টর করে দেবেন। এমন সম্বন্ধ ছেড়ো না, ইব্রাহিম ভাই!"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "বিষয়-আশয় সম্বন্ধে বিশেষ জান্‌বার তেমন দরকার নেই; তবুও জিজ্ঞাসা করি তাদের আয় কত?"

আত্মীয় বলিলেন "আয় যেমন করে হোক সালিয়ানা নিট্ আট নয় শত টাকা। তাতেই বেশ চ'লে যায়।"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "বছরে আটনয় শত টাকা আয়, তাইতে তারা আমিরী করে; কৈ, আমি ত ঐ আয়ে কিছুই কর্‌তে পারিনে। ধার-কর্জ্জ আছে কি?"

আত্মীয় বলিলেন "আরে, আজকালকার দিনে কোন্ বড় মানুষের ধার-কর্জ্জ নেই। আদব-কায়দা রক্ষা কর্‌তে গেলে, চা'ল ঠিক

রাখ্‌তে গেলে, অনেক মিঞাকেই ধার-কর্জ্জ কর্‌তে হয়। বিশেষ ছেলে লেখাপড়া শিখেছে, তারপর একটু সাহেবী কায়দা আছে; ইয়ার-দোস্ত আছে, খরচপত্র একটু বেশী হয়ই ত।"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "আচ্ছা, দেখি বিবেচনা করে।"

আত্মীয় বলিলেন "অমন ছেলে কি ব'সে থাকে; কত বড় বড় যায়গা থেকে কথাবার্ত্তা আস্‌ছে। তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না, এইটেই ঠিক করে ফেল।"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "আর কয়দিন পরেই আলি বাড়ী আস্‌ছে। সে এলেই সব ঠিক করা যাবে।"

কয়েকদিন পরে আমি ও আলি আই এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলাম। যে দিন বাড়ীতে পৌঁছিলাম, সেই দিনই অপরাহ্ণকালে মৌলবী সাহেবের বাড়ী গেলাম।

কুশল জিজ্ঞাসাদির পর আমি বলিলাম "লয়লার বিবাহের কিছু ঠিক কর্‌তে পার্‌লেন কি?"

মৌলবী সাহেব বিষণ্ণমুখে বলিলেন "কিছুই ত ঠিক কর্‌তে পারি নাই; পাঁচ-ছয়টা ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কোনটাই পছন্দ হচ্চে না।"

আমি বলিলাম "আমি একটী ছেলের সন্ধান দিতে পারি। সে এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। ছেলে খুব ভাল, পাশ হবেই। আলির সঙ্গেও তার জানাশুনা আছে। রামচন্দ্রপুরের আজিম খন্দকারের ছেলে। আমি একদিন তার কাছে কথাটা তুলেছিলাম; লয়লার লেখাপড়া ও গুণের কথা শুনে সে স্বীকার করেছে। কিন্তু, তার বাপের অমতে ত সে বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে না।"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "যে ছেলে পিতার অমতে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়, সে ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিবাহ কিছুতেই দেব না সতীশ!"

আমি বলিলাম "তা হলে রামচন্দ্রপুরে লোক পাঠালে হয় না?"

মৌলবী সাহেব বলিলেন "আমাকে যদি যেতে বল, আমি রাজী আছি।"

আমি বলিলাম "আগেই আপনার গিয়ে কাজ নেই; তারা যদি বিবাহ না দিতে চায়, তা হলে আপনার মনে কষ্টও হবে, অপমানও বোধ হবে।"

মৌলবী সাহেব হাসিয়া বলিলেন "সতীশ, মান-অপমান নিজের কাছে। লোকের কথায় কি কারও মান যায়। তা বেশ, আমি না হয় নাই গেলাম, আলিকেই পাঠিয়ে দেব! কিন্তু আমার মনে হয়, আর দিন-দশেক পরে গেলেই ভাল হয়; সে সময় ছেলেটীও পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিবে। ছেলের পিতা যদি ছেলের মতের অপেক্ষা করেন, তা হ'লে এখন গিয়ে ত বিশেষ কাজ হবে না।"

তাহাই স্থির হইল। কিন্তু এ কয়দিনও আলি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না; যেখান-যেখান হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তাহার দুই তিনটী দেখিয়া আসিল, কোনটাই তাহার পছন্দ হয় না, তাহার পিতার কথা ত দূরে থাকুক। তাহাদের এই প্রকার বাছ-বিচার দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনেরা মহা বিরক্ত হইয়া পড়িলেন; মৌলবী সাহেব নীরবে তাঁহাদের বাক্যবাণ সহ্য করিতে লাগিলেন।

বিশেষ আশা করিয়াই আলি রামচন্দ্রপুরে গিয়াছিল। লক্ষ্মীপুর হইতে রামচন্দ্রপুর অনেক পথ, প্রায় সাত ক্রোশ। এই সাত ক্রোশ পথ

অতিক্রম করিয়া একদিন অপরাহ্নকালে আলি রামচন্দ্রপুরে আজিম খন্দকারের গৃহে উপস্থিত হইল। খন্দকারের পুত্র তাহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিল ; খন্দকার সাহেবও আলির পরিচয় পাইয়া এবং তাহার পড়াশুনার কথা শুনিয়া তাহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন।

সন্ধ্যার পর আলি খন্দকার-সাহেবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। খন্দকার সাহেব মেয়ে সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়া অতি গম্ভীর-ভাবে বলিলেন "দেখ বাবা, তোমার ভগিনীর কথা যাহা বলিলে, তাহাতে তাহাকে আমার পুত্রবধূ করিতে পারিলে আমি খুবই সৌভাগ্য বোধ করিতাম। আমি মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার পক্ষপাতী। আমি তেমন লেখাপড়া না জানিলেও বিদ্যার কদর বুঝি। কিন্তু বাবা, কথাটা কি জান ? আমার অবস্থা তেমন ভাল নয় ; পোষ্য অনেকগুলি। তারপর এ অঞ্চলে একটু মান-সম্ভ্রমও আছে। এ সব রক্ষা কর্‌তে গেলে আজকালকার দিনে একটু সহায় দরকার। ছেলেটি খোদার মেহের-বাণীতে এবার পরীক্ষায় পাশ হবে ব'লে খুব আশা কর্‌ছি। বি-এ পাশ হ'লেই তাকে একটা ডিপুটীগিরিতে বাহাল কর্‌বার আমার ইচ্ছা। তুমি ত জান, মুরুব্বীর জোর না থাক্‌লে, জবর সুপারিশ না থাক্‌লে ডিপুটীগিরি হয় না। তুমি মনে কিছু কোরো না, তোমার বাবার সুপারিশে কি আমার ছেলের ডিপুটীগিরি হবে ? আমি খোলাখুলিই বলি, আমি ছেলের বিবাহ, একটা ডিপুটী কি-সদর আলা কি মুনসেফ, নিতান্ত পক্ষে কোন জজ আদালতের বড় উকিলের মেয়ের সঙ্গে দেব। ভবিষ্যৎ ত ভাবতে হবে।"

আলি এ কথার কি উত্তর দিবে। সে মস্তক নত করিয়া কথাগুলি শুনিল। একবার তাহার মনে হইল, খন্দকার সাহেবকে বলে,

"সাহেব, আমার পিতার কথা একবারও ভাবিলেন না! তিনি কি ইচ্ছা করিলে ডেপুটী কি·মুন্‌সেফ হইতে পারিতেন না? কিন্তু তাহা তিনি হন নাই। তিনি সাধারণ মানুষের মত নহেন। দেশের ছেলে-দের জ্ঞানে ধর্ম্মে বিভূষিত করিবার জন্য এমন মহান্‌ স্বার্থত্যাগের কি কোন মাহাত্ম্যই নাই? সুধু ধন-জন, সুধু পদ-প্রসার! আমার পিতার মত দেব-হৃদয় কার আছে?" কিন্তু যুবক আলি এই বৃদ্ধ খন্দকার সাহেবের সম্মুখে এ সব কথা বলিতে পারিল না; তাহার পিতার নিকটে এমন শিক্ষা সে পায় নাই; সে গুরুজনের সম্মান করিতে জানে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া খন্দকার সাহেব বলিলেন "বাবা, মনে কিছু কোরো না। আমার যা অভিপ্রায়, তা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। তোমার পিতার প্রতি আমি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি না; কিন্তু আমি আমার সন্তানগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য খোদাতালার কাছে দায়ী। তোমার ভগিনীর ভাল সম্বন্ধই হইবে, খোদার কাছে এই প্রার্থনা করি।"

আলি আর কি করিবে; সে-রাত্রি সেখানেই থাকিয়া পরদিন এই সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। পথে আসিতে-আসিতে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, হায় আল্লা, আমার পিতাকে কেহ চিনিল না! এ দুনিয়ায় কি প্রকৃত সদ্‌গুণের আদর হইবে না। আমার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না ভগিনীর কদর কি কেহই বুঝিবে না।

বাড়ীতে আসিয়া আলি সমস্ত কথা তাহার পিতাকে বলিল; আমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মৌলবী সাহেব আলির বিষাদমাখা কথা শুনিয়া ও তাহার মলিন মুখ দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য যেন কাতর হইয়া পড়িলেন। তাহার পরই তাঁহার মোহ কাটিয়া গেল। তাঁহার

মুখে তখন যে দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, তাঁহার মুখ হইতে তখন যে দেববাণী নির্গত হইয়াছিল, তেমন জ্যোতিঃ কখনও দেখি নাই, তেমন কথা মানুষের মুখে কখনও শুনি নাই,—এ জীবনে শুনিব কি না বলিতে পারি না। তিনি অতি ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আলি, আমার কথা শোন। তুমি লেখা-পড়া শিখিয়াছে। আল্লার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হউক। কিন্তু আজ খোদাতালার নাম স্মরণ করিয়া, হজরতকে সম্মুখে উপস্থিত জানিয়া, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, এ জীবনে কখনও পরের দাসত্ব করিবে না; মুসলমান বালক-বালিকার শিক্ষা-বিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। দারিদ্র্যকে ভয় করিও না। যে খোদাতালা তোমাকে পয়দা করিয়াছেন, তিনি দয়াময়; তিনি তোমার দিনান্তে শাকান্নের ব্যবস্থা করিবেন। এই শাকান্নে সন্তুষ্ট থাকিয়া তুমি আমার স্বজাতীয় মুসলমান বালক-বালিকাগণকে জ্ঞান-ধর্ম্মে বিভূষিত করিবার জন্য জীবনপাত করিও। আর এক কথা। এ কথা কোন পিতা কোন সন্তানকে বলিতে পারেন না। আমি কিন্তু বলিতেছি আলি, তুমি জীবনে বিবাহ করিও না; চিরকুমার থাকিয়া এই শিক্ষাবিধানব্রত উদযাপন করিও। দুনিয়ার যিনি মালিক, সকল সৎকর্ম্মের যিনি সহায়, তাঁহারই দোয়া প্রার্থনা করিও। মানুষের অনুগ্রহ চাহিও না। তোমার পিতার এই আদেশ প্রতিপালন করিয়া আমার জীবনব্যাপী সাধনার পুরস্কার দিতে কি তুমি, আলি, পরাঙ্মুখ হইবে ?"

আলিমদ্দীন উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র; সে তখনই পিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!" সে আর কথা বলিতে পারিল না।

তখন মৌলবী সাহেব বলিলেন "বল আলি! লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদর্ রসুলুল্লা!"

পিতা-পুত্রে তখন তারস্বরে ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে হিন্দু মুসলমানের যিনি দেবতা, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলেন। আমি এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি তখন ভুলিয়া গেলাম, আমি হিন্দু আর ইঁহারা মুসলমান; আমি মৌলবী সাহেবের পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "সতীশ, তুমিও আমার ছেলের মত। জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইও বাবা! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি; তোমার আদর্শ-জীবন হইবে।" আমি নত মস্তকে তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম।

তাহার পর তিনি বলিলেন "দেখ আলি, আমার আর একটা কথা আছে। লয়লার বিবাহ। আমার মনের কথা শোন; আমি কেমন জামাই চাই, শোন। আমি ধনদৌলত চাই না; আমার মেয়েকে আমি যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছি, তাহাতে সে দরিদ্রের কুটীরে শাক-অন্ন খাইয়া, কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। আমি বি এ, এম-এ পাশ করা জামাই চাই না। যে ছেলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাকে আমি জামাই করিব না; যে ছেলে বিলাস-ব্যসনকে দূরে পরিহার করে নাই, তাহাকে আমি জামাই করিব না; যে মুসলমানের সন্তান হইয়া আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত আচার-অনুষ্ঠান করে না, পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ করে না, খোদাতালার উপর বিশ্বাসবান্ নহে, তাহাকে আমার জামাই করিব না; যে মুসলমানের সন্তান হইয়া আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহাকে আমি জামাই করিব না; যে বাঙ্গালী মুসলমান হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার মাতৃভাষা

বলিয়া গ্রহণ করে নাই, তাহাকে আমি জামাই করিব না ; যে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে অমূল্যরত্ন সংগ্রহ করে নাই, তাহাকে আমি জামাই করিব না ; সর্ব্বশেষ কথা, যে মুসলমানের সন্তান হইয়া মুসলমানের সম্মানরক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাহাকে আমি জামাই করিব না। এমন ছেলে যদি না পাওয়া যায়, আমার কন্যা চিরকুমারী থাকিবে ; তোমার পবিত্র ব্রতের সহকারিণী হইবে। তাহা যদি সে না পারে, তাহাকে বলিও, সে আমার কন্যা নহে ; বৃথা এতকাল তাহার শিক্ষা-বিধান করিয়াছি। বৃথা তাহার মাতা তাহাকে———”

তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। লয়লা ও তাহার মাতা আসিয়া মৌলবী সাহেবের পদযুগল ধারণ করিলেন। লয়লার মাতা বলিলেন “প্রভু, আমার পুত্র-কন্যাকে তোমার চরণে **উৎসর্গ** করিলাম।”

আমি দেখিলাম, পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসল।

ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান

বাসুদেবপুরের রামতনু ন্যায়বাগীশের নাম এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিত-সমাজের সকলেই জানিতেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত ছিলেন; কত দূরদেশ হইতে কত ছাত্র তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিত; তিনিও অকাতরে ছাত্রগণকে অন্নদান করিতেন এবং ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিতেন।

বাড়ীতে তাঁহার ব্রাহ্মণী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্মণ-কন্যা একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য করিতেন এবং অন্নপূর্ণার মত প্রতিদিন অনেকগুলি ছাত্রের দুই বেলা অন্ন-পানের ব্যবস্থা করিতেন। বাহিরে ন্যায়বাগীশ মহাশয় যেমন মহাদেবের ন্যায় ছিলেন, বাড়ীর ভিতরে তেমনই তাঁহার গৃহিণী জগদ্ধাত্রীর মত বিরাজ করিতেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বিষয়-আশয় ছিল না বলিলেই হয়, সামান্য দশ বার বিঘা ব্রহ্মোত্তর মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল; কিন্তু দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার চতুষ্পাঠীর সমস্ত ব্যয় চালাইতেন; কেহ মাসে যত চাউল লাগে, তাহার ভার লইয়াছিলেন; কেহ বা দৈনিক বাজার-খরচের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দিতেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তা মোটেই মনে স্থান দিতেন না;--গৃহস্থালী আছে, আর গৃহিণী আছেন; তিনি ছাত্রদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনাতেই সময় অতি-বাহিত করিতেন।

সংসারের কোন অভাবের কথাই তাঁহার মনে উঠিত না, সুধু মধ্যে

মধ্যে একটী অতৃপ্ত বাসনা তাঁহাকে পীড়া দিত। তিনি যখন ভাবিতেন যে, তাঁহার সহিত স্বর্গীয় রামলোচন ভট্টাচার্য্যের নাম লোপ হইবে, তখন তিনি বড়ই বিমর্ষ হইতেন। গৃহিণীর বয়স ৪০ পার হইয়া গেল, তিনিও বৃদ্ধ হইলেন—আর তাঁহাদের সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রতিবেশী অনেকে নানাপ্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা বলিতেন, কিন্তু ন্যায়বাগীশ মহাশয় সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না; তিনি বলিতেন, ও সবে কিছু হয় না।

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ব্রাহ্মণীকে কিন্তু কেহ কখন এজন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতে শোনে নাই। কেহ তাঁহার বন্ধ্যাত্বের কথা বলিলে, তিনি বলিতেন "তোমরা বল কি? আমার কত ছেলে আছে। এক সঙ্গে ২৫।৩০টী ছেলে যে আমাকে মা বলে ডাকে, আমি বুঝি বন্ধ্যা! নয় বছর বয়সে এই বাড়ীতে এসেই আমি মা হয়ে বসেছি। আমার মত ভাগ্যবতী কে? না, না, আমার আর ছেলেতে কাজ নেই; যারা আছে, তারাই বেঁচে থাক, আমায় মা বলবার লোকের অভাব কি।"

কথাটা বড়ই ঠিক। এই যে ছাত্রের দল—ইহারা ন্যায়বাগীশের গৃহে পুত্র-স্নেহেই প্রতিপালিত হইত;—এই দূরদেশে আসিয়াও কেহ কোনদিন জননীর অভাব অনুভব করে নাই। এতগুলি সুসন্তানের ভক্তির অর্ঘ্যে তাঁহার মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হইয়া যাইত।

বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে? এই বৃদ্ধ বয়সে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, একটি সুকুমার শিশু ন্যায়বাগীশের গৃহিণীর কোল জুড়িয়া বসিল। সকলেই ইহাতে আনন্দিত হইলেন;—ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর বংশ-লোপ হইবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা দূর হইল।

বৃদ্ধ বয়সের সন্তান;—ন্যায়বাগীশ মহাশয় এই সন্তানের মায়ায় বদ্ধ

হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শাস্ত্রালোচনার আগ্রহ ক্রমে কমিতে লাগিল; পূর্ব্বে যে প্রকার উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন, গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহা ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। এখন টোলগৃহে তিনি ছেলেকে কোলে লইয়া উপবিষ্ট হইতেন; ছেলে হয় ত ন্যায়দর্শন পুঁথির পাতার উপর কোমল পদদ্বয় স্থাপন করিত, কখন বা ছাত্রদিগের পাঠের নানা বিঘ্ন জন্মাইত; ন্যায়বাগীশ সহাস্ত বদনে বালকের খেলা দেখিতেন। রামপ্রসাদের সামান্য একটু অযত্ন হইবার যো ছিল না; রামপ্রসাদ একটু কাঁদিলেই ন্যায়বাগীশ ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ধাবিত হইতেন এবং ছেলের কান্না নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেন।

এত আদরে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল। রামপ্রসাদ যখন দশম বর্ষে পদার্পণ করিল, তখনও তাহার লেখাপড়া মোটেই অগ্রসর হইল না। সেই যে যথারীতি বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্তই। পণ্ডিত-গৃহিণী মধ্যে মধ্যে স্বামীকে এ কথা বলিতেন; ছেলে যে তাঁহার আদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ কথাও তিনি স্বামীকে জানাইতেন; কিন্তু ন্যায়-বাগীশ এ সকল কথায় মোটেই কাণ দিতেন না; বলিতেন "আহা ছেলেমানুষ, একটু আবদার করবে না! আর দেখ গিন্নী, ঐ যে চাঞ্চল্য দেখ্‌চ, ওটা তেজীয়ান পুরুষের পূর্ব্বাভাস। রামপ্রসাদ কালে যে খুব তেজস্বী হবে, এ তারই লক্ষণ। এর জন্ত তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি ওর কোষ্ঠী গণনা করে দেখেছি, ও কালে একটা মানুষের মত মানুষ হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র কখন মিথ্যা বলে না। পড়াশুনার কথা বল্‌ছ—তার জন্য ভেব না। হোক্ না বয়স দশ বৎসর। কার ঔরসে ওর জন্ম, সেটা প্রণিধান করছ না গিন্নী। আর সকল ছাত্র দশবৎসরে

যা শিখতে পারবে না, আমার রামপ্রসাদ ছ-মাসে—বুঝেছ গিন্নি, এই ছটী মাসে তা শিখে নেবে। সেই জন্যই ত আমি ওকে পড়ার জন্য তাড়না করি না। তুমি দেখে নিও, তোমার এ ছেলে কি হয় ?”

গৃহিণী ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বাক্য বেদবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন সুতরাং তিনি নীরব হইতেন ; কিন্তু মধ্যে-মধ্যে রামপ্রসাদের দুষ্টামি, তার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, তার অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া তিনি বেদবাক্যের উপরও সন্দেহ করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের বয়স যখন সতর বৎসর হইল, তখন ন্যায়বাগীশ মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে. ছেলেকে এতদিন আদর দিয়া তাহার মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছেন ; এত বড় ধীমান পণ্ডিতের পুত্র কি না এই এত বয়সেও কিছুতেই মুগ্ধবোধের সন্ধির গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিল না ; এদিকে কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় সে গ্রামের অতি বড় বয়াটে ছেলেকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ষণ্ডামি গুণ্ডামিতে রামপ্রসাদ অদ্বিতীয় ; তামাকের শ্রেণী হইতে প্রোমোসন পাইয়া এখন সে গঞ্জিকার ক্লাশে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এ সংবাদও ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের কর্ণে পৌঁছিল ! কিন্তু কি মায়াতেই তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এত দেখিয়া, এত শুনিয়াও তিনি রামপ্রসাদকে শাসন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

রামপ্রসাদের মাতা পুত্রের গুণের কথা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে তিরস্কার করেন ; কিন্তু ন্যায়বাগীশ মহাশয় সে কথা শুনিয়া দুঃখিত হন। এখন তাঁহার সুর নামিয়া গিয়াছে ; তিনি গৃহিণীকে বলেন “শোন গিন্নী, যার অদৃষ্টে যা আছে, তা কেউ খণ্ডাতে পারে না,—স্বয়ং বিধাতারও সে ক্ষমতা নেই। দুঃখ কোরে কিছু লাভ নেই, উপদেশেও কিছু হয় না। ওর অদৃষ্টে যদি ভাল কিছু লেখা থাকে, তা হলে দেখতে পাবে গিন্নি,

তোমার ঐ ছেলেই দিগ্বিজয়ী হবে। আমার ত মনে হয়, ওর স্বভাব এমন থাকবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্র কি মিথ্যা হ'তে পারে। আর গণনায় কিছু ভুল হয় নি গিন্নি, কিছু ভুল হয় নি। এখন যাই হোক, পরে আমার রামপ্রসাদ মানুষের মত মানুষ হবে। তবে যা দুঃখ এই যে, আমরা আর তখন বেঁচে থাক্‌ব না।"

ন্যায়বাগীশ-গৃহিণী বিষণ্ণবদনে বলিতেন "তোমার কথা যে মিথ্যা হবে না, এ বিশ্বাস ত এতদিন করে এসেছি। কিন্তু তুমি আমার অপরাধ নিও না, এখন সময়-সময় মনে হয়, তুমি হয় ত গণনায় ভুল করেছ; নইলে তোমার ছেলে কি এমন হতে পারে।"

ন্যায়বাগীশ বলিলেন "না গিন্নি, রামতনু ন্যায়বাগীশ এত কালের মধ্যে কোন দিন ভুল করে নাই। তুমি দেখে নিও, আমার কথা ঠিক হবে। তুমি রামপ্রসাদকে তাড়না কোরো না। জান ত প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"

গৃহিণী বলিলেন "তা দেখ, একটা কাজ কর। যে রকম দেখছি, তাতে ওর যে আর বেশী বিদ্যা হবে, তা মনে হয় না। তুমি ওকে ধরে-বেধে এই দশকর্ম্মটা শিখিয়ে দেও, আর ঘর-কয়েক যজমান করে দেও, তা হলেই ওর একটা পথ হবে। নইলে দুদিন পরে ও কি ক'রে খাবে। ঐটে কর, আর ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও।"

ন্যায়বাগীশ বলিলেন, "গিন্নি, ও-দুইয়ের একটাও আমার দ্বারা হবে না। স্বর্গীয় রামলোচন ভট্টাচার্য্যের পৌত্র, আমার পুত্র যে যজনকার্য্য করবে, তার ব্যবস্থা আমি করতে পারব না। আর, বিবাহের কথা যা বলছ, তাতেও আমি সম্মত নই। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হয়ে নিজের কর্ত্তব্য বুঝে বিবাহ করবে, এই আমার মত, এই আমার উপদেশ। আমি

ইহার অন্যথাচরণ করতে পারব না। এ অনুরোধ তুমি আমাকে কোরো না। ওর অদৃষ্টে বিবাহ থাকে, হবে। আর যদি যজনকার্য্য করে পিতৃপুরুষের নাম ডুবাতে চায়, ডুবাবে, আমি তার সহায়তা করতে পারব না—সে কিছুতেই হবে না।”

এই কথোপকথনের দুইমাস পরে একদিন ন্যায়বাগীশ মহাশয় জ্বরে পড়িলেন। দুই দিন লঙ্ঘন দিলেন; জ্বর ছাড়িল না। তৃতীয়দিন কবিরাজ ডাকা হইল,—ডাক্তারী ঔষধ ত তিনি সেবন করিবেন না। কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া এবং নানা প্রশ্ন করিয়া অনেক চিন্তার পর দুইটি ঔষধ বাহির করিলেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন “রাধাবল্লভ বড়ি দুটি কেন নষ্ট করবে? গৃহিণী তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, আমি জানলে নিষেধ করতাম। আমার পক্ষে এখন নারায়ণের নামই এক-মাত্র ঔষধ।"

রাধাবল্লভ কবিরাজ বলিলেন, “খুড়ো ঠাকুর, আপনি বল্‌ছেন কি? এ অতি সামান্য জ্বর, নাড়ীর অবস্থাও খারাপ নয়। আপনি অমন নিরাশ হচ্চেন কেন?”

ন্যায়বাগীশ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন “নিরাশ কি রাধাবল্লভ! আমি ত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। তুমি নাড়ীতে কিছু পাচ্ছ না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আজ দিবা দ্বিতীয় প্রহর অন্তে আমার দেহান্ত হইবে। তুমি ঔষধপত্রের আয়োজন না করে সকলকে সংবাদ দাও। যাওয়ার সময় একবার সকলের মুখ দেখে যাই;—কি মায়ার বন্ধন রাধাবল্লভ!”

তাহার পর পুত্র রামপ্রসাদের দিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে চাহিলেন;

কিন্তু তাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "গিন্নি, তোমার কোন সাধই পূর্ণ হোলো না ব'লে দুঃখিত হয়ো না। ব্রহ্মবাক্য অন্যথা হয় না—জ্যোতিষ কখন মিথ্যা বলে না,—আমার গণনা ভুল হয় নাই গিন্নি! তোমায় ত কতবার বলেছি, রামপ্রসাদ মানুষ হবে—মানুষের মত মানুষ হবে, তবে আমি তা দেখে যেতে পারব না। আমি যে ঘোর মায়াজালে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম গিন্নি। তাই তোমার মনে এতদিন কষ্ট দিয়েছি। আমি যে বহুপূর্ব্বেই কার্য্য সুসম্পন্ন করতে পারতাম; কিন্তু তোমার দিকে চাহিয়াই গিন্নি, আমি আজ পাঁচ বৎসর কিছুই করি নাই। তাই রামপ্রসাদের ব্যবহারে তুমি এত কাতর হয়ে পড়েছ। আজ আমার যাবার দিন;—আর ত বিলম্ব করলে চলবে না।" রাধাবল্লভের দিকে চাহিয়া বলিলেন "রাধাবল্লভ, আজ অষ্টমী তিথিটা কতক্ষণ আছে, পাঁজিখানা দেখ ত। আমার যেন বোধ হচ্চে ছাব্বিশ দণ্ড তিতাল্লিশ পল। যাক, তুমি একবার ভাল করে দেখ। প্রসাদ, পঞ্জিকাখানা এনে দাও ত তোমার দাদাকে।"

রামপ্রসাদ পঞ্জিকা আনিয়া দিলে রাধাবল্লভ দেখিয়া বলিলেন "খুড়া-ঠাকুর, আপনার কথা কি ভুল হয়, অষ্টমী ছাব্বিশ দণ্ড তিতাল্লিশ পলই আছে।"

ন্যায়বাগীশ মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "এতকাল ত ভুল হয় নাই; তবে আজ মৃত্যুশয্যায় কি না, তাই তোমাকে দেখতে বললাম। সে কথা থাকুক।" এই বলিয়া তিনি নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিন চারি মিনিট পরে বলিলেন "প্রসাদ, একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছে বাবা! তা হোক, সব কাজেরই সময় আছে ত! পূর্ব্বেও একবার সময়

এসেছিল ; কিন্তু আমি তখন মায়ার বশীভূত হয়ে সে সময়টা যেতে দিয়েছিলাম। দেখ বাবা প্রসাদ, তোমাকে কোন দিনই কিছু বলি নাই। তুমি যে বিদ্যার্জ্জন করলে না, কুসঙ্গে প'ড়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেলে, তোমার যে পানদোষ পর্য্যন্ত হ'ল, এ সব দেখে-শুনেও আমি কিছু বলি নাই—কোন উপদেশ দিই নাই। এ সব যে তোমার চাই, তা আমি জান্‌তাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও যদি তোমাকে সেই শুভদিনে দীক্ষা প্রদান করতাম, তা হ'লেও তার পরে তোমাকে এই দুর্ভোগ ভুগতে হোতো। তা সেটা সেরে নেওয়াই গেল। আজ প্রসাদ, তোমাকে আমি দীক্ষিত করব। আজ অষ্টমী ; আগামী অষ্টমীই মহাষ্টমী—মা মহামায়ার মহাপূজা। আমি আজ তোমাকে মন্ত্রদান করব ; আগামী মহাষ্টমীতে মহা-সন্ধিক্ষণে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। যাও বাবা, শীঘ্র স্নান করে এস। অধিক বিলম্ব কোরো না,—আমার আর বেশী সময় নাই। যাও বাবা, বিষণ্ণ হোয়ো না—কাতর হোয়ো না, যাও।"

রামপ্রসাদ চলিয়া গেলে ন্যায়বাগীশ মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন "গিন্নি, আমি আজ তোমার পুত্রকে মহামন্ত্র দান করব। সম্মুখে মহাপূজা! মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তোমার পুত্র সিদ্ধিলাভ করবে। সেদিন গিন্নি! তোমার ছেলেকে সারাদিন উপবাসী থাকতে বোলো। সন্ধ্যার পর সে যেন আমার বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া আমার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে। তারপর যা হয় দেখতেই পাবে গিন্নি! আমার জন্য বেশী দিন ভাবতে হবে না—অতি কম সময় গিন্নি! অতি কম সময়। তোমার কিঞ্চিৎ বৈধব্য যোগ আছে যে।"

এই কথা বলিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবিরাজ উঠিয়া গেলেন।

কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইল। ছাত্রগণ, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ যে যেখানে ছিলেন, সংবাদ শুনিবামাত্র ন্যায়বাগীশের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় সকলের সহিতই কথা বলিতে লাগিলেন; মৃত্যুর কোন লক্ষণই কেহ দেখিতে পাইলেন না।

একটু পরেই রামপ্রসাদ স্নান করিয়া বাড়ীতে আসিল। ন্যায়বাগীশ বলিলেন "বেলা বোধ হয় দ্বাদশ দণ্ড পার হয়েছে।"

একজন ছাত্র বলিলেন "হাঁা, দ্বাদশদণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে।"

তিনি তখন গৃহিণীকে বলিলেন "সাধ্বি, আর ত বিলম্ব নাই। আমাকে একখানি কুশাসন পাতিয়া দাও। না না, আমাকে ধরিতে হইবে না; আমার দেহ ত দুর্ব্বল বা অবসন্ন হয় নাই।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি কুশাসন পাতিয়া দিলেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া শয্যা হইতে নামিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন; উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া যোগাসনে বসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "আহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিব কি?"

ন্যায়বাগীশ সহাস্য বদনে বলিলেন "দেবি, সন্ধ্যা-আহ্নিকের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; আর নয়। রামপ্রসাদ, আমার কাছে এস।"

রামপ্রসাদ পিতার সম্মুখে বসিলে তিনি বলিলেন "রামপ্রসাদ, এখন আর আমি তোমার পিতা নহি, তুমি আমার পুত্র নহ,—এখন আমি গুরু, তুমি শিষ্য। আমি আজ তোমাকে মন্ত্র দান করিব। ইহার পর কি করিতে হইবে, তাহা মন্ত্রই তোমাকে বলিয়া দিবে; আর যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন বোধ কর, তোমার জননীকে জিজ্ঞাসা করিও! তিনি সব জানেন" এই বলিয়া গৃহিণীর দিকে উৎফুল্ল নয়নে চাহিলেন।

তাহার পর শরীর ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া তিনি আসন সুদৃঢ় করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সমাগত জনমণ্ডলী একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "শিষ্য, অগ্রসর হও।"

ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে এমন ভাবে, এমন স্বরে কথা বলিতে কেহ শোনে নাই; সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রামপ্রসাদ আরও একটু অগ্রসর হইলে ন্যায়বাগীশ মহাশয় তাহার মস্তক নিজের বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন।

রামপ্রসাদ কাঁপিয়া উঠিল; শরীরের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইলে, দেহ যেমন কাঁপিয়া উঠে, রামপ্রসাদের ঠিক সেই ভাব হইল; পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হইল। ন্যায়বাগীশ মহাশয় তাহাকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া দিলেন।

তাহার পর পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। দুই তিন মিনিট পরে একবার মাত্র গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইল—

ওঁ

তাহার পরই সব শেষ। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের পার্থিব লীলার অবসান হইল

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গোত্রীর পথে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে এক রাত্রি অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আমাকে

বাঙ্গালী দেখিয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার জীবন-কথা যতটুকু বলিয়াছিলেন, তাহাই এতকাল পরে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ অসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন ; আমাকেও অসমাপ্ত রাখিতে হইল।

ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে একদিন সেই সন্ন্যাসীর সহিত আমার এই কলিকাতাতেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই ;—আমার মত বিষয়াসক্ত সংসারীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কিন্তু তিনি বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্য হইতেও আমাকে চিনিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের কথা ফলিয়াছে। তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ সত্য-সত্যই এখন দেশবিখ্যাত ব্যক্তি,— একজন প্রধান সন্ন্যাসী। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য। তাঁহার নাম, তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই বাঙ্গালা দেশেও তাঁহার অনেক শিষ্য আছেন—পশ্চিমাঞ্চলে ত শিষ্যের অভাবই নাই। দেশ ও জনহিতকর কার্য্যের অগ্রণীবৃন্দের মধ্যে তিনি একজন। তাঁহার নাম আমি বলিব না,—সাধু সন্ন্যাসীর গৃহস্থাশ্রমের কথা বলিতে নাই,—সে পরিচয় গোপন করিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্ত।

১

আইন-ক্লাশের পড়া শেষ করিয়া বেলা এগারটার সময় অক্ষয় তাহার মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে আসিয়া দেখিল, তাহার টেবিলের উপর একখানি ডাকের চিঠি রহিয়াছে। খামের উপর তাহারই গ্রামের পোষ্ট-আফিসের ছাপ-মারা; কিন্তু হাতের লেখাটা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাড়ীর চিঠি, অথচ লেখা অপরিচিত হাতের,—অক্ষয়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। দুইমাস পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে যাইয়াও সে তাহার মাতাকে জীবিতা দেখিতে পায় নাই—মায়ের মৃতদেহ পুত্রের অগ্নি-সংস্কারের অপেক্ষা করিয়াছিল। আবার আজ এ কি?

অক্ষয় কম্পিত-হস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একটু পড়িয়াই অক্ষয়ের মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে যেন কেমন হইয়া গেল; সে পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট দুই তিন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সে পুনরায় পত্রখানি তুলিয়া লইল। পত্র-খানিতে অল্প কয়েকটী কথাই লিখিত ছিল। যিনি পত্র লিখিয়াছেন, তিনি নাম প্রকাশ করেন নাই,—লিখিয়াছেন—"কোন আত্মীয়।" অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও অক্ষয় হাতের লেখা চিনিতে পারিল না।

তাহার পর সে পকেট হইতে বাক্সের চাবী বাহির করিয়া পত্রখানি রাখিবার জন্য বাক্স খুলিল; এবং বাক্স-বোঝাই কাপড়-চোপড় তুলিয়

তাহার নীচে পত্রখানি রাখিয়া দিয়া বাক্স বন্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ছাত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া গেল।

হ্যারিসন-রোডের ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া অক্ষয় বাড়ীতে পিতার নিকট টেলিগ্রাম করিল যে, সে বিশেষ কারণে অপরাহ্ণ ১টার লোকাল ট্রেণেই বাড়ী যাইতেছে ; ষ্টেশনে যেন পালকী-বেহারা উপস্থিত থাকে।

অক্ষয়ের যে গ্রামে বাড়ী, তাহার নাম—ঠিক নামটা না হয় না-ই বলিলাম—এই ধরিয়া লউন—সে গ্রামের নাম রহিমপুর ; ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের শক্তিগড় ষ্টেশন হইতে এই গ্রাম তিন মাইল দূরে। অক্ষয়ের পিতা শ্রীযুক্ত রামকমল ঘোষ বর্দ্ধমান-রাজের একজন বড় পত্তনীদার। অবস্থা খুব ভাল। সন্তানের মধ্যে ঐ একটি ছেলে অক্ষয়কুমার। অক্ষয় এম-এ পাশ করিয়া বি এল পড়িতেছে। বড়মানুষের এম-এ পাশ, একমাত্র পুত্র—কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই —ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন কেহই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারেন নাই। মায়ের অদৃষ্টে পুত্রবধূর মুখদর্শন ছিল না।—তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

অক্ষয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া আইন পড়িয়া জ্ঞান-সঞ্চয় করে, আর তাহার পিতা দেশে বসিয়া আইন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া অর্থ ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন ; পুত্র পিতার অন্যায়-অত্যাচারের কথা শুনিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, আর পিতা সেই একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য প্রজা-পীড়ন করিয়া কোম্পানীর কাগজে লোহার সিন্দুক পূর্ণ করেন।

অন্দর-মহলে ছেলে মায়ের কাছে কাঁদিত—মা ছেলের কাছে কাঁদিত ; কিন্তু কর্ত্তাকে কোন কথা বলিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না ;—রামকমল ঘোষ তেমন বাপের বেটাই ন'ন যে, স্ত্রী-পুত্রের কথা শুনিয়া জমীদারী চালান।

দুইমাস পূর্ব্বে মাতা স্বর্গে গেলেন—ছেলের কাঁদিবার স্থানও থাকিল না। মাতার শ্রাদ্ধাদির পর অক্ষয় যখন কলিকাতায় আসে, তখন সে মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে, শীঘ্র আর বাড়ীতে যাইবে না। কিন্তু এই বেনামী চিঠি পাইয়া সে বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। চিঠিতে কি লেখা ছিল, তাহা যখন সে কাহাকেও বলিল না, তখন গল্প-লেখক সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সে কথা পাঠকগণের গোচর করা সঙ্গত মনে করিতেছেন না।

(২)

শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া অক্ষয় দেখিল ; বাড়ী হইতে পাল্‌কী-বেহারা আসিয়াছে ; সঙ্গে আসিয়াছে বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস।

কালিদাস অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিল "দাদাভাই, হঠাৎ এলে যে? শরীর ভাল আছে ত?"

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে কহিল "শরীর ভাল আছে কালিদা! মনটা কেমন খারাপ ঠেক্‌ল ; তাই একবার তোমাদের দেখ্‌তে এলাম।"

কালিদাস অনেক-কালের চাকর ; অক্ষয়কে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে ; অক্ষয়কে সে ভালরূপই চেনে। সে বলিল, "না দাদা-ভাই, তোমার শরীর-মন দুই-ই খারাপ হোয়েছে। বুড়োর কাছে গোপন করো না। তা, এখন থাক্, চল বাড়ী যাই, তার পর সব শুন্‌ব।" এই বলিয়া অক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে ; বেহারারা লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইল। একজন বলিল "কালিদা, তুমি একটা লণ্ঠন নিয়ে পিছনে এস, আমরা একটা আলো নিয়ে চলে যাই।"

কালিদাস বলিল "আমাকে আর ফেলে যেতে পারবি নে ; তোরা যত দৌড়েই যাস্ না কেন, কালিদাস তোদের সঙ্গে চল্‌তে পারবে।"

কালিদাস পাল্‌কীর সঙ্গে-সঙ্গেই চলিল। পাল্‌কী যখন গ্রাম পার হইয়া মাঠের মধ্যে পড়িল, তখন কালিদাস গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

"আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায় ;

ওগো দরদী গো—।"

কালিদাসের এই করুণ সুর অক্ষয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল ;—তাহার মনও যে আজ সত্য-সত্যই উদাসী হইতে চাহিয়াছিল। কালিদাস কি তাহার মনের বেদনা বুঝিতে পারিয়াই এমন করুণ-স্বরে, ঐ গানটী গায়িতেছে ? কালিদাস গায়িল—

"সে যে এমন করে দেয় গো মন্ত্রণা,

ও সে উড়িয়ে দেয় প্রাণের পাখী, মানা মানে না ;

সে উড়ে যায় বিমানেরি পথে,

শীতল বাতাস লাগে গায়।"

অক্ষয় পাল্‌কীর মধ্যে শয়ন করিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে কালিদাসের গান শুনিতেছিল ; তাহার প্রাণ-পাখী আজ শীতল বাতাসের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু সে শীতল বাতাস ত সে বাড়ী যাইয়া পাইবে না ;—আজ ত আর তাহার স্নেহময়ী জননী তাহার পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া নাই ;—আজ সে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য বাড়ী যাইতেছে !

কালিদাস গান শেষ করিয়া নীরব হইতেই একজন বেহারা বলিল, "ও কালিদা, আর একটা ভাল গান ধর না।"

কালিদাস বলিল, "আর গান-টান ভাল লাগে না ভাই !" এই বলিয়াই সে গান ধরিল—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এতকাল করে খেলা, গেছে বেলা,
এই সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে,
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি,
তিনিই মশার ভরসা ভবে।"

অন্ধকার রাত্রি, মাঠ নির্জ্জন; তাহার পর কালিদাসের মধুর কণ্ঠস্বর—অক্ষয় আর পাল্‌কার মধ্যে থাকিতে পারিল না—তাহার প্রাণের মধ্যে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"ওরে, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।"

সে তখন বেগারাদিগকে পাল্‌কা থামাইতে বলিল। বাহকেরা পাল্‌কী নামাইলে সে বাহির হইয়া বলিল "তোরা পাল্‌কী নিয়ে চল, আমি কালিদাসের সঙ্গে একটু হাটি। ঐ ত গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আমি এ পথটুকু হেঁটেই যেতে পারব।"

কালিদাস আপত্তি করিল। বাহকেরা বলিল "কর্ত্তা শুনলে রাগ করবেন।"

অক্ষয় সে কথায় কর্ণপাত করিল না। বাহকেরা পাল্‌কী লইয়া অগ্রসর হইল।

তখন কালিদাস বলিল "দাদাভাই, এখন বল-ত, তুমি পড়া কামাই করে কেন হঠাৎ বাড়ী এলে। নিশ্চয়ই তোমার মনে কিছু আছে।"

অক্ষয় বলিল "কালিদা, তোমার কাছে গোপন করব না আমি বাবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য এসেছি।"

"বাবার ব্যবস্থা। তুমি কি পাগল হয়েছ দাদাভাই।"

"না কালিদা, আমি পাগল হইনি এখনও, কিন্তু হবারও দেরী নেই।"

"কেন, কি হয়েছে, আমাকে খুলেই বল না ভাই!"

অক্ষয় বলিল "কালিদা, সে কথা বল্‌তেও আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি বাবাকে জান না যে, আমার মুখ দিয়ে পিতৃনিন্দা শুন্‌বে?"

কালিদাস বলিল "তা হ'লে কথাটা তোমার কাছেও গিয়েছে। কে তোমাকে এসব কথা লিখেছে?"

"কে লিখেছে, তা জানিনে; সে নাম প্রকাশ করে নাই। কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা কালিদা। কি আমার দুরদৃষ্ট! ছেলেকে বাপে শাসন করে, এই ত এতদিন জান্‌তাম; আমার অদৃষ্টে তার উলটো হলো।"

কালিদাস বলিল "তা কি করবে মনে করেছ? কর্ত্তাকে ত জান; আর তুমি কি-ই বা বলবে তাঁকে? বল্‌তেই বা পারবে কেন? না দাদা-ভাই, ওসব ব্যাপারের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই। যার যা হচ্ছে, সে তাই করুক। তুমি কালই কল্‌কাতায় ফিরে যাও। যে দিন মা-লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, সেইদিনই—আর সেই দিন-ই বা কেন, আমি অনেক আগে থেকেই সব জানি।"

অক্ষয় বলিল "সে কি আর আমিই জান্‌তাম না, কালিদা! কিন্তু মায়ের ভয়ে, তাঁরই অনুরোধে আমি চুপ করে ছিলাম। আর বাড়ীর মধ্যে যা হচ্ছিল, তা হচ্ছিল, এখন যে বাহিরে গেল। ছিঃ ছিঃ, কালিদা, আমার যে মরতে ইচ্ছা করে।"

কালিদাস বলিল "তা তুমি যে বাড়ী এলে, কি মতলব কোরে এসেছ বল দেখি। জান ত, কর্ত্তার মেজাজ!"

"সব জানি কালিদা! কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, হয় বাবাকে কাশী যেতে হবে, আর না হয় ত আমার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। এই দুইয়ের এক আমি করে যাবই।"

এই সময় তাহারা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিদাস অক্ষয়কে বলিল "দেখ দাদা-ভাই, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে হঠাৎ কোন কাজ করো না। জান ত, তোমার বাবাকে। সাবধান!"

অক্ষয় কোন কথা না বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

(৫)

কর্ত্তা রামকমল ঘোষ মহাশয় পুত্রের প্রতীক্ষায় বৈঠক-খানার বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। অক্ষয় বারান্দায় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি কহিলেন "তোমার কলেজ কি এরই মধ্যে বন্ধ হোলো অক্ষয়!"

অক্ষয় বলিল "না, কলেজ বন্ধ হয় নাই। মনটা ভাল ছিল না, তাই একবার বাড়ীতে এলাম।"

"তা এসেছ, বেশ করেছ। তবে কলেজ কামাই করাটা বোধ হয় ভাল নয়; পড়াশুনার বোধ হয় তাতে ক্ষতি হয়। তা হোক; যখন এসেছ, তখন, আজ হোলো বৃহস্পতিবার, কাল-পরশু দুটো দিন থেকে রবিবারে বোধ হয় কল্‌কাতায় গেলেই ভাল হয়।"

অক্ষয় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সারারাত্রি অক্ষয় কত কথা ভাবিল; সে মনে-মনে যে পন্থা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, বাড়ী আসিয়া ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোনটাই অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপরও নহে, কর্ত্তব্যও নহে। কিন্তু সে যে এ অবস্থায় কি করিতে পারে, পিতাকে কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য কি করা যাইতে পারে, তাহা সে মোটেই ভাবিয়া পাইল না।

সুধু নিজের উপরই তাহার ধিকার জন্মিতে লাগিল। আর মনে হইতে লাগিল তাহার সেই স্নেহময়ী, সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী জননীর কথা। আজ তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে, তাঁহার কাছে সে মনের বেদনা জানাইতে পারিত। এখন তাহার একমাত্র পরামর্শদাতা বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস—তাহার পরম সুহৃদ্ কালিদা!

প্রাতঃকালে উঠিয়া অক্ষয়ের গৃহে মন টিঁকিল না। ইতিপূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া সে প্রায়ই গ্রামের কোথাও যাইত না। আজ তাহার কাছে বাড়ীতে বসিয়া থাকা ভাল লাগিল না; সে রাস্তায় বাহির হইল।

অল্পদূর যাওয়ার পর সে দেখিল যে, অলাক্ষত ভাবে সে পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন পূজার ফুল তুলিবার জন্য সাজি-হস্তে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

তিনি বলিয়া উঠিলেন "এই যে অক্ষয়, কবে বাড়ী এলে বাবা? শরীর ভাল আছে ত?"

অক্ষয় তখন কি করে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল "আজ্ঞে কা'ল এসেছি।"

"হঠাৎ কি মনে করে বাড়ী এলে বাবা?"

অক্ষয় বলিল "এমনি দুই-এক দিন ঘুরে যাবার জন্য এসেছি। রবি-বারেই আবার কলকাতায় ফিরে যাব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বাবা অক্ষয়, তোমার সঙ্গে—" কথাটা অর্দ্ধপথেই

বন্ধ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি কাতর-নয়নে অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে বিষাদ-মাখা; সে চাহনি যেন একটু সহানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ!

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এমন করিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিতে দেখিয়া অক্ষয়ও কাতর হইল, বুঝিতে পারিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেন অমন করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন! রামকমল ঘোষের ছেলের সঙ্গে তাঁহার কি দরকার, তাহাও অক্ষয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মনে হইল, কেন সে মূর্খের মত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়াছিল? কেন সে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া এ পথে আসিয়াছিল? অক্ষয়ও চুপ করিয়া রহিল। সে কি বলিবে? তাহার কি কিছু বলিবার মুখ আছে?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "তুমি এখন কোথায় যাচ্চ অক্ষয়?"

অক্ষয় বলিল "বিশেষ কোথাও নয়, এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।"

"তুমি রবিবারে কল্‌কাতায় যাবে বল্‌ছিলে না?"

"আজ্ঞা, রবিবারেই যাব মনে করেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া থামিয়া-থামিয়া বলিলেন "তা—দেখ—এই যাবার আগে,—নাঃ, আর কাজ নেই। তুমি এখন যাও বাবা। আমারও বেলা হোলো। মা জগদম্বা!"

অক্ষয় এইবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল "যাবার আগে কি আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বার কথা বল্‌ছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "হ্যাঁ—;—না, তা আর কাজ নেই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মলিন মুখ ও তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অক্ষয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল "আপনাকে আর কিছু বল্‌তে হবে না, আমি সব জানি. আমি—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্ষয়ের কথায় বাধা দিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া "বাবা—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ; আর একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অক্ষয় তখন বলিল "সে সব কথা আর আপনার ব'লে কাজ নেই। এখন বলুন ত, এর উপায় কি ? আমি তারই জন্যই বাড়ী এসেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, তোমরা বড়মানুষ; আমি কি বল্‌ব। কথাটা ত আর গোপন নেই; আমি যে আর মুখ দেখাতে পারিনে বাবা! উপায়ের কথা বল্‌ছ ? একমাত্র উপায় আছে। নিজের হাতে মেয়েটার মুখে বিষ তুলে দেওয়া। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই; তারপর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমার আর ব্রাহ্মণীর আত্মহত্যা! বাবা, এ সংসারে ঐ বিধবা মেয়েটির মুখ চেয়েই আমরা বেঁচে ছিলাম। শেষে কি না এই হোলো। ব্রাহ্মণের মেয়ে—কি বল্‌ব বাবা! তোমরা গ্রামের জমিদার ; তোমরা গরিবের ধর্ম্মরক্ষা করবে, না তোমরাই এমন কাজ করলে। অভিশাপ দেব না বাবা, কিন্তু বল্‌তে পার, কি পাপে আমার এই শাস্তি।"

অক্ষয় বলিল "তা বল্‌তে পারিনে ; কিন্তু, আপনারা উচিত প্রতীকার করলেন না কেন ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "বাবা, তাতে কি হোতো ;– তাতে

কি আমার এই জাতিনাশের প্রতীকার হোতো ; অপমান যে আরও বেড়ে যেত। না বাবা, সে দুর্ম্মতি আমার হয় নাই।"

অক্ষয় বলিল "বেশ। আমি কি করতে পারি, তাই বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাই করব। এদেশে আর আমি মুখ দেখাব না ; বিষয়-সম্পত্তি কিছু আমি চাই না। আপনার জন্য কি করতে পারি, তাই বলুন ; সেই কাজ শেষ করে আমি জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাতর কণ্ঠে বলিলেন "তোমার অপরাধ কি বাবা, তুমি যে সোণারচাঁদ ছেলে। তুমি তোমার জন্মদাতাকে অপমান কোরো না। জান ত আমাদের শাস্ত্রে আছে, পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ।"

"ঠাকুর মশাই, আমার ধর্ম্মও নাই, আমি স্বর্গও চাই না। সে দ্বার আমার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ; এমন পিতার পুত্র কিছুরই অধিকারী নয়।"

"তা হ'লে তুমি কি করতে চাও ?"

"সেই কথাই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমি কি বলব বাবা !"

অক্ষয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "দেখুন, আমি একটা কথা বলি। আপনি সপরিবার কাশী চ'লে যান। যা খরচ লাগে, আমি আজই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। তারপর সেখানে আপনাদের যা ব্যয় হবে, সে সব আমি দেব।"

"বাবা অক্ষয়, মনে কিছু কোরো না। আমার কন্যাকে যে ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট করেছে, তারই অর্থে আমি কাশীবাস করব ; সে আমি পারব না বাবা ! সে কিছুতেই না।"

অক্ষয় বলিল "তাঁর অর্থ নয় ঠাকুর মশাই! আমার স্বোপার্জ্জিত টাকা আছে, আমার পরীক্ষার জলপানির টাকা। তাই আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছি। তবে আমি তাঁর পুত্র, এই ব'লে যদি আপনি আমার সাহায্য না নিতে চান, তা হলে ত আর কোন উপায় দেখি না। কিন্তু আপনার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। পাপের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত—অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দিন।" এই বলিয়া অক্ষয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল।

অক্ষয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন কথাবর্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন অন্দরে যাইবার দ্বারের পার্শে দাঁড়াইয়া আব একজন তাঁহাদের কথা শুনিতেছিল। সে আর কেহই নহে—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিধবা কন্যা তারা। তারা যে ঘরে ছিল, তাহার পশ্চাতে বহির্ব্বাটীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা হইতেছিল। তারা প্রথমে দুইচারিটি কথা অল্প শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার পরই সে উঠিয়া আসিয়া দ্বাবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

অক্ষয় যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, তখন তারা উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "না,—না বাবা—না না, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করছি।" তাহার পরই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি যাইয়া কন্যাকে কোলে লইয়া বসিলেন; দেখিলেন তাহার সংজ্ঞা নাই।

অক্ষয় দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়া জল লইয়া আসিল এবং তারার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বৃথা! তারার ঘৃণিত, অভিশপ্ত প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তারার মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন "জীবনদানে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। সহস্র জীবন নরকভোগেও নয় তারা—কিছুতেই নয় ; - এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

তারার অকস্মাৎ দেহত্যাগে অক্ষয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে এক-দৃষ্টিতে তারার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্ষয়কে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন "বাবা অক্ষয়, আর কি দেখ্‌ছ, এখন বাড়ী যাও।"

অক্ষয় কাতর স্বরে বলিল "এ জীবনে আর নয়।"

"সে কি কথা অক্ষয় ? তুমি বাড়ী যাবে না কেন ?"

অক্ষয় বলিল "আমার পাপেরও ত প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "তোমার পাপ! তুমি ত কোন অপরাধই কর নাই বাবা।"

অক্ষয় তীব্র কঠোর স্বরে বলিল, "অপরাধ করি নাই ? আপনি কি বল্‌ছেন ঠাকুর ? আমি মহা অপরাধী। আমার অপরাধ—আমি রামকমল ঘোষের পুত্র,—এ অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত নেই।" এই বলিয়াই অক্ষয় উন্মাদের মত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

তাহার পরে অক্ষয় যে কোথায় গেল, কেহই এত কালের মধ্যে সে সন্ধান দিতে পারিল না।

প্রবাসের কথা

* যাহার জীবনের অধিকাংশ প্রবাসে অতিবাহিত হইযাছে, তাহাকে অনেক সময় অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ অনেক অসুবিধাও ভোগ কবিতে হইয়াছে। আমি ত চিব প্রবাসী। কথন বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে, কথন শুধু ভ্রমণের জন্য, আবাব কথনও বা কোন প্রকারে, মানুষের পক্ষে যে সময় অমূল্য, তাহা নষ্ট কবিবার জন্য নানাস্থানে বেড়াইয়াছি। এই শেষোক্ত অবস্থায় অনেক দিন পূর্ব্বে আমি একবার হিমালয়-ক্রোড়স্থিত দেবাদুনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। সে সময়ে আমার মাথায় অনেক খেয়াল চাপিযাছিল, সে সকল কথা আব এখন বলিব না। একদিনের একটি ঘটনা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি দেরাদুনে থাকি সামান্য কাজকর্ম্মও করি, আর অবশিষ্ট সময পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াই।

এই সময়ে একদিন বিনা-সংবাদে আমার দেশের একটি যুবক আমাব নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া ত আমি অবাক্। তাহাব পব শুনিলাম, যুবকটি বাড়ীতে ঝগড়া কবিয়া সন্ন্যাসী হইবার শুভ অভিপ্রায়ে আমাব নিকট উপস্থিত হইযাছেন।

তাহাকে দশ পনর দিন আমার নিকট রাখিলাম, ক্রমে তাহার রাগ কমিয়া গেল, সন্ন্যাসী হইবার অভিপ্রায়ও সে ত্যাগ করিল। তখন বাড়ী যাইবার জন্য তাহাব আগ্রহ প্রবল হইল। আমার নিকট আসিবাব সময়ে সে একাকী আসিয়াছিল, কিন্তু যাইবার সময় তাহাকে একাকী পাঠাইতে আমার ইচ্ছা হইল না।

তখন দেরাদুনে রেল হয় নাই; দেরাদুন হইতে ৪২ মাইল দূরে সাহারণপুরে গেলে তবে রেল পাওয়া যাইত। এই ৪২ মাইল পথ অপরিচিত একাওয়ালার সঙ্গে তাহাকে যাইতে দিতে আমার সাহস হইল না, কি জানি পথের মধ্যে যদি তাহার সন্ন্যাসী হইবার বাসনা আবার জাগিয়া উঠে। সেই জন্য সাহারণপুর পর্য্যন্ত তাহাকে রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলাম; এবং একদিন প্রাতঃকালে অনিন্দ্যসুন্দর একায় আরোহণ করিয়া আমরা সাহারণপুর যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে সাহারণপুরে পৌঁছিয়া মনে করিলাম, এতটা পথই যখন আসিয়াছি, তখন যুবকটির সঙ্গে গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাকে একেবারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ীতেই তুলিয়া দিয়া আসি। যুবকটির জন্য একখানি মধ্যম শ্রেণীর হাবড়া পর্য্যন্ত যাইবার টিকিট এবং আমার জন্য একখানি গাজিয়াবাদের রিটার্ণ টিকিট কিনিলাম।

আমাদের গাড়ী যখন গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিল, তখন হাবড়ার গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে হইয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গীটিকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলাম। প্রবেশ দ্বারের নিকট একজন টিকিট-সংগ্রাহক ছিল; সে 'জল্‌দি যাও' বলিয়া আমার টিকিটের অৰ্দ্ধেক ছিঁড়িয়া লইল; আমার আর তখন টিকিটখানি দেখিয়া লইবার অবকাশ ছিল না, টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয়ও টিকিটখানির দিকে চাহিয়া দেখি-লেন না। সঙ্গীটিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। গাড়ী আমার দেশের দিকে ছুটিয়া চলিল! আমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কত কথা তখন মনে হইল; মনে হইল এই গাড়ী সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমার জন্মভূমির দিকে যাইতেছে। একদিন পরেই এই

গাড়ী আমার দেশে উপস্থিত হইবে। তখন মনে পড়িল, আমার সেই ছায়াশীতল ক্ষুদ্র গ্রামের কথা,—মনে পড়িল আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কথা,—মনে পড়িল আমার বাল্যখেলার কুটীর,—মনে পড়িল আমার ছেলেবেলার কথা। আরও কত কথা মনে পড়িল। একবার মনে হইল, কি জন্য এমন করিয়া পথে-পথে বেড়াইতেছি, যাই—দেশে ফিরিয়া যাই; আমার সেই পল্লীভবনে ফিরিয়া যাই। এত দেশ ঘুরিলাম, এত পাহাড় পর্ব্বত দেখিলাম, শান্তির অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইলাম; কোথাও শান্তির সন্ধান পাইলাম না। আর না, দেশে চলিয়া যাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কোথায় যাইব, কাহার কাছে যাইব। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্ল্যাটফরমের এক-পার্শ্বে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম।

রাত্রি তখন এগারটা। শেষ-রাত্রিতে তিনটার পর এলাহাবাদ হইতে যে গাড়ী আসিবে, সেই গাড়ীর যাত্রী লইয়া তবে আমাদের সাহারণ-পুরের গাড়ী ছাড়িবে। ততক্ষণ ষ্টেশনেই থাকিতে হইবে।

গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্না-রাত্রি। আমি সেই বেঞ্চে বসিয়াই রাত্রি কাটাইবার অভিপ্রায় করিলাম। দেখিলাম আরও দুই চারিজন যাত্রী আর কয়েকখানি বেঞ্চে বসিয়া আছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়! ধীরে ধীরে আমার চক্ষু বুজিয়া আসিল, আমি নিদ্রিত হইলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না; হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চাহিয়া দেখি, আমার পার্শ্বেই একটি লোক বসিয়া আছে। আমি জাগিয়াছি দেখিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি তাহার দিকে চাহিলাম না, তখনও নিদ্রার অলস ভাব আমাকে পরিত্যাগ করে নাই।

একটু পরেই একজন পুলিসম্যান আসিয়া আমাকে আমার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, আমি সাহারণপুর যাইব। তখন সে বলিল, সাহারণপুরের গাড়ী ও দিকের প্লাটফরমে গিয়াছে। আমি তখন যাইয়া সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করিলাম।

গাড়ী কখন ছাড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। একটু বেলা হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন দেখিলাম গাড়ী চলিতেছে। একটু পরেই গাড়ী মিরাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। মনে করিলাম এই স্থানে একটু বেশী সময় গাড়ী দাঁড়ায়; এইখানে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লই। এই মনে করিয়া প্রথমেই পকেটে হাত দিলাম; দেখি আমার রুমালখানি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার সঙ্গে দশটী টাকার একখানি নোট ও নগদ দুইটী টাকা ছিল। তাহা ঐ রুমালেই বাঁধা ছিল। কখন কেমন করিয়া রুমালখানি কে হস্তগত করিয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

বিষম বিপদ! পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম ছয়টী পয়সা মাত্র সম্বল রহিয়াছে, বুকের পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম রিটার্ণ টিকিট-খানাও রহিয়াছে। তবুও রক্ষা! টিকিটখানি অপহৃত হইলে আরও মঙ্গল হইত!

কি করি, ষ্টেসনে হাত মুখ ধুইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। ছয়টি পয়সা সম্বল, যাইতে হইবে দেরাদুন পর্য্যন্ত। মনে করিলাম পয়সা ছয়টী আর এখন খরচ করিব না—একবারে নিঃসম্বল হওয়া কিছু নয়। ভগবান্ আজ অনাহারেই ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু অদৃষ্টে যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লাঞ্ছনাভোগ লিখিত ছিল, তাহা তখনও বুঝিতে

পারি নাই মনকে প্রবোধ দিলাম যে, সাহারণপুরে নামিয়া একা ভাড়া করিব, বাসায় যাইয়া তাহাকে টাকা দিব; আর সঙ্গে যে ছয়টী পয়সা আছে, তাহারই দ্বারা সাহারণপুরে জলযোগ করিব। এক দিনের অনাহারে মারা যাইব না;—জীবনের অনেক দিন অনাহারে কাটিযাছে।

মধ্যাহ্নকালে সাহাবণপুবে গাড়ী থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া গেটের নিকট টিকিট দিতে গেলাম। টিকটথানি বাহির করিয়া টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয়ের হস্তে দিলে তিনি টিকিটথানি দেখিয়াই আমার গতিরোধ করিলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা কবায় তিনি টিকিট-খানি আমাকে দেখিতে দিলেন। ও হরি! গাজিয়াবাদের টিকিট-সংগ্রাহক শেষার্দ্ধখানি লইয়াছেন, আমাকে প্রথমার্দ্ধ ফিরাইয়া দিয়াছেন। তখন যে তাড়াতাড়ি, তাহাতে আমিও টিকিটথানি দেখিয়া লই নাই, সে ব্যাপারও পরীক্ষা করিযা দেখে নাই।

এখন উপায়—সম্বল ত সেই ছয়টী পয়সা। টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয় মেজাজ গরম করিয়া জানাইলেন যে, আমাকে গাজিয়াবাদ হইতে সাহারণপুর পর্য্যন্ত মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া দিতে হইবে; তাহার পর ট্রাফিক সুপারিণটেণ্ডেণ্ট মহাশযের নিকট আবেদন করিলে আমি এই ভাড়া পরে ফেরত পাইব।

পরে ফেরত পাইব. তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু এখন টাকা কোথায় পাই। টিকিট সংগ্রাহক হিন্দুস্থানী মহাশয় বলিলেন যে, আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে; তাঁহার উপস্থিত কার্য্য শেষ হইলে তিনি আফিসে যাইয়া আমার টাকা লইবেন এবং তাহার রসিদ দিবেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার নিকট মোটে ছয়টী পয়সা

আছে। বারটী টাকা রুমালে বাঁধা ছিল, তাহা পথে অপহৃত হইয়াছে।

ষ্টেসনের হাকিম মহাশয় বোধ হয় আমার এজাহারে বিশ্বাস করিলেন না; তিনি অধিকতর উদ্ধত ভাবে বলিলেন "অভি গোল মৎ করো।" বুঝিলাম অদৃষ্টে আজ বিশেষ লাঞ্ছনা-ভোগ আছে। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যাত্রীদিগের টিকিট সংগ্রহ শেষ হইলে তিনি বাদশাহী রকমে পদ-ক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। কি করি, বিদেশ, পরিচিত কেহই সেখানে নাই—চারি-দিকে চাহিয়া একটী বাঙ্গালীর মুখও দেখিতে পাইলাম না।

টিকিট-ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই টিকিট-সংগ্রাহক আমাকে বলিলেন যে, ভাড়ার টাকা আমাকে দিতেই হইবে, নতুবা তিনি আমাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আমি বলিলাম, আমার কোন অপরাধই নাই, গাজিয়াবাদের টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয়ই এজন্য অপরাধী। কিন্তু, আমার কথায় কর্ম্ম-চারিপ্রবর কর্ণপাত করিলেন না; সেখানে আরও যে দুই চারিজন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারাও ঐ কথারই সমর্থন করিলেন।

আমি বলিলাম, আমার নিকট ছয়টীর অধিক পয়সা নাই, আমি ভাড়া দিতে পারিব না। তবে তাঁহারা যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি দেরাদুন পৌঁছিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতে পারি।

আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া আমার বিচারক মহাশয় আমাকে যে "কম্প্লিমেণ্ট" দিলেন, তাহা আর লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

আমার তখন বড়ই রাগ হইল; আমি বলিলাম, এত কথার

প্রয়োজন নাই ; আপনাদের আইনে যাহা বলে আপনারা তাহাই করুন। আমি আর আপনাদের সাহত কোন কথাই বলিতে চাহি না। আমি এ কথাগুলি হিন্দীতে বলি নাই, ইংরাজীতে বলিয়াছিলাম। তাহারা কিন্তু আমার কথায় নরম হইল না।

আমরা যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম, তখন দ্বারের সম্মুখে একটী ইংরাজ দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন। আমার শেষ কথা শুনিয়া ইংরাজটী আফিস-ঘরের মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয় তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। সাহেব তখন আমার দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিলেন "আপনাকে ত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

আমি বলিলাম "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনি সাহেব হইয়াও আমাকে চিনিয়াছেন, কিন্তু আমার স্বদেশবাসী এই মহাত্মারা বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন না।" এই বলিয়া আমার টাকা চুরির কথা বলিলাম ; টিকিটের গোলের কথা ত অভিযোগকারীই বলিয়াছিলেন।

সাহেব তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

আমি বলিলাম "যাইবার ত ইচ্ছা ছিল দেরাদুন ; কিন্তু এই ভদ্রলোকদিগের যে প্রকার আগ্রহ দেখিতেছি, তাহাতে আপাততঃ আমাকে পুলিশ হাজতেই আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভদ্রলোককে কত টাকা ভাড়া দিতে হইবে ?"

টিকিট-সংগ্রাহক মহাশয় যেন কত বলিলেন। সাহেবটী তখন

তাঁহার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন এবং আমাকে যথারীতি রসিদ দিতে বলিলেন।

আমি ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার স্বদেশবাসী কয়েকজন কর্ম্মচারী আমাকে এই প্রকার বিপন্ন দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ বা সাহায্য করা দূরে থাকুক, আমাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আর এই অপরিচিত সাহেবটী আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। যাহাদিগকে আমি ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি, তাহারা আমার সহিত কি ব্যবহার করিল, আর এই সদাশয় সাহেবটী উপযাচক হইয়া আমার সাহায্য করিতে উপস্থিত হইলেন! আমি তখন সাহেবকে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি যখন কথা বলিতে উদ্যত হইলাম, তখন আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সাহেবটী আমার মনের কথা বুঝিয়া ফেলিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "No thanks Babu" (বাবু, ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই) সাহেবের এই ব্যবহারে আমি সত্য-সত্যই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না।

সাহেব তখন আমাকে বলিলেন "আমিও দেরাদুন হইয়া মসূরী যাইব। আমার গাড়ী প্রস্তুত; জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠিয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে দেরাদুন পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; আপনার কোন কষ্ট হইবে না।"

আমি তখন বলিলাম "আপনাকে ধন্যবাদ না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আপনি আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি একখানি একা ভাড়া করিয়া দেরাদুনে যাইতে পারিব। আপনাকে আমার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে দিতে পারি না। যদি

ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইতে পারি কি ?”

সাহেব বলিলেন “আমার পরিচয়ের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমরা ত এক-সঙ্গেই যাইতেছি, পথে পরিচয় করিব।” এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

বাহিরে যাইয়া দেখি দুইখান ডাকগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর মাথার উপর একরাশ বাক্স বিছানা প্রভৃত রহিয়াছে এবং গাড়ীর পার্শ্বে খানসামা, বেহারা প্রভৃতি চারি পাঁচ জন বহিয়াছে। তখন বুঝিলাম সাহেব বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি।

সাহেব তখন বেহারাকে ডাকিয়া কি বলিলেন, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা শুনিতে পাইলাম না। বেহারা সাহেবের কথা শুনিয়া একখানি গাড়ীর মধ্য হইতে বিছানা বাহির করিয়া ফেলিল এবং গাড়ীর উপর হইতে আর একটী বিছানা লইয়া সেই গাড়ীর মধ্যে পাতিল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, আমার জন্যই শয্যা প্রস্তুত হইতেছে। ভাবিলাম, কোথায় আজ আমার স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের অনুগ্রহে হাজত-গৃহে ভূমিশয্যায় রাত্রি কাটাইবার কথা, আর কোথায় এই ডাকগাড়ীতে দুগ্ধফেননিভ শয্যা! ইহারই নাম অদৃষ্ট!

আমি তখন সাহেবের নিকটে গিয়া বলিলাম, “মহাশয়, আপনার চাকরদিগের কষ্ট হইবে; তাহারা ঐ গাড়ীর মধ্যে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাদের কোথায় স্থান হইবে? আমার জন্য তাহারা বিশেষ কষ্ট ভোগ করিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।”

সাহেব আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন “নেভার মাইণ্ড! তাহারা

এই গাড়ীর মাথায় বসিয়া যাইবে। ভাল কথা, আপনার বোধ হয় আহার হয় নাই ?"

আমি বলিলাম "সে জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না। আমার এখন কিছুই আহার করিবার ইচ্ছা নাই।"

সাহেব বলিলেন "তবে গাড়ীতে উঠিয়া বসুন। আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। রাত্রি নটার মধ্যে দেরাদুনে পৌঁছিতে হইবে।"

তখন আর কি করি ; গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সাহেবের গাড়ী আগে ছাড়িয়া দিল, তাহার পরই আমার গাড়ী ছাড়িল।

অর্দ্ধেক পথ গেলে একটা ডাকবাঙ্গালা পাওয়া যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমার গাড়ী সেই ডাকবাঙ্গালার নিকট পৌঁছিল। এই বাঙ্গালার নিকট গাড়ী আসিবামাত্র দেখি, সাহেব বাঙ্গালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "ওয়েল, আপনার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি। একটু চায়ের আয়োজন করা গিয়াছে ; আপনার অপেক্ষায় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না।"

সাহেবের এই উদারতা ও সহৃদয়তায় আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইংরাজ যে আমার মত কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীর সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা আমি জানিতাম না—ইহা আমি কখনও দেখি নাই—কখন শুনিও নাই।

আমি তখন সাহেবকে ধন্যবাদ করিয়া বারান্দায় যাইয়া বসিলাম। চা আসিল, রুটী আসিল, নানা প্রকার ফল আসিল। বলা বাহুল্য, আমার সারাদিন অনাহার, আমি সেগুলির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলাম।

তখন আমি পুনরায় সাহেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ত কিছুতেই পরিচয় দিতে চাহিলেন না; অবশেষে অনেক অনুরোধ করার পর আমাকে তাঁহার পরিচয় দিলেন, কিন্তু আমাকে বলিয়া দিলেন যে, সে দিনের ঘটনা সম্বন্ধে আমি অন্যের নিকট গল্প করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার নাম যেন কাহাকেও না বলি। তিনি বলিলেন যে, তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে ভালবাসেন না।

এতদিন পরেও, তাঁহার নাম বলিব না; এইটুকু বলিতে পারি যে তিনি একজন সিবিলিয়ান; সে সময়ে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের দপ্তরে খুব একটা বড় কাজ করিতেন'

সাহেবের পরিচয় পাইয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কোথায় আমি পথের ভিখারী, আর কোথায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের বড় সাহেব! তখন বুঝিলাম, এই প্রকার মহানুভব ব্যক্তি আছেন বলিয়াই ইংরাজ আজ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের গাড়ী দেরাদুনে পৌঁছিল। সাহেব ঐ গাড়ীতেই রাজপুর যাইয়া হোটেলে অবস্থান করিবেন; তিনি দেরাদুনে অপেক্ষা করিলেন না।

আমি গাড়ী হইতে নামিয়া সাহেবের গাড়ীর নিকট গেলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন এবং বলিলেন, তিনি একমাস মসূরীতে হিমালয়ান হোটেলে থাকিবেন। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন দিন মসূরী যাই, তাহা হইলে যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিস্মৃত না হই। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তাহার গাড়ী চলিয়া গেল।

সেই সপ্তাহের শনিবারেই আমি মসূরীতে যাইয়া সাহেবের সহিত

সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে দেখিয়া যে কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমাকে সেদিন মসূরীতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু আমি আর সেখানে থাকিলাম না. সেই দিন অপরাহ্ণকালেই দেরাহূনে ফিরিয়া আসিলাম। সাহেব আমার দেরাছুনের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

পরদিন বেলা একটার সময়ে একজন কুলী আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আমাকে সাহেবের লিখিত একখানি পত্র দিল, এবং তাহার পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া বসিল। তাহার পর সেই বোঝা খুলিয়া আমার সম্মুখে সাজাইতে লাগিল।

সাহেবের পত্রে অবগত হইলাম যে, আমি পূর্ব্বদিন তাঁহার আতিথ্য স্বীকার না করায় তিনি আমার জন্য কিছু জিনিষ পাঠাইলেন, আমি যেন দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করি। চাহিয়া দেখি, সাহেব নানা প্রকার ফল, বিস্কুট, চাটনী প্রভৃতি পাঠাইয়াছেন।

সাহেব যেদিন এলাহাবাদ ফিরিয়া যান, সে দিনে দেরাহূনে আমিও তাঁহাকে ফলমূলাদি দিয়াছিলাম। তাহার পরও দুই তিনমাস তিনিও আমাকে পত্র লিখিতেন, আমিও তাঁহাকে পত্র লিখিতাম। তাহার পরই আমি হিমালয়ের জঙ্গলে ডুবিয়া যাই।

এবং

(১)

কিশোর ঘোষ জাতিতে গোয়ালা, কিন্তু সে রাগ করিয়া জাতি-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার পিতা ও তস্য পিতা গোয়ালার ব্যবসায়েই জীবন-যাপন করিয়াছিল ;—ঘৃত, দধি, ক্ষীর বিক্রয় করিত—গ্রামের বাজারে দুগ্ধ বিক্রয় করিত--ভদ্রলোকের বাড়ীতে দুগ্ধ যোগান দিত এবং সেরকে অন্ততঃ একপোয়া জলও দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া মা-ঠাকুরাণীদিগের নিকট চালাইত। কিশোর প্রথমে এই পৈতৃক ব্যবসায়েই নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কোন গোল না হইলে, ঐ কার্য্যেই গোপ-জীবন কাটাইয়া দিত।

গোল এমন কিছু নহে। একদিন তাহার পিতা নবীন ঘোষ নিকটের এক গ্রামের এক ধনী-গৃহস্থের বাড়ীর কোন ব্যাপার উপলক্ষে একবারে আড়াই মন দুগ্ধের বায়না লইয়া আসিল। কিশোরের বয়স তখন উনিশ বৎসর। কিশোর যখন আড়াই মন দুগ্ধের বায়নার কথা শুনিল, তখন একেবারে অবাক্ হইয়া গেল,—আড়াই মন দুধ! "বাবা, এত দুধ কেমন করিয়া জোগাড় হইবে?"

নবীন বলিল, "যে ক'রেই হোক, বায়নার বুঝ দিতেই হইবে।"

দুগ্ধে যে একটু-আধটুকু জল দেওয়া হয়, তাহা কিশোর জানিত এবং তাহা তাহাদের কৌলিক প্রথা বলিয়া মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও কোন কথা বলিত না; কিন্তু কি জানি কেন, কোন দিনই

দুগ্ধে জল মিশাইতে তাহার হাত সরিত না, তাহার পিতা ও মাতাই সে পবিত্র কার্য্য শেষ করিত।

বাবুদের বাড়ীতে যে দিন আড়াই মন দুগ্ধ দিবার কথা, সেদিন প্রাতঃকালে সাতটার মধ্যে নবীন ঘোষের বাড়ীতে যে দুগ্ধের আমদানী হইল, তাহা মাপিয়া দেখা গেল—দেড় মন দুইমন। নবীন ঘোষ তখন নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে এক কলসী জল আনিয়া, মাপিয়া মাপিয়া দুগ্ধের সঙ্গে মিশাইতে লাগিল। কিশোরের এ প্রতারণা আর সহ্য হইল না; সে বলিল, "বাবা, এ কি করছ?"

নবীন পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল "আড়াই মন ত হওয়া চাই!"

"হওয়া চাই ব'লে কি এমন কাজই করতে হবে?"

নবীন রাগিয়া বলিল "তাই হয় রে বেটা! তুই দেখ্‌ছি ধর্ম্মপুত্ত্র যুধিষ্ঠির। যা, যা, সরে যা।"

কিশোরের রাগ হইল; সে বলিল, "এ দুধের বাঁক আমি কাঁধে করছি নে!"

"তুই করবি নে, তবে কি লোক ভাড়া করে আন্‌তে হবে?"

কিশোর বলিল, "এমন অধর্ম্ম আমি করতে পারব না।"

নবীন ভারী চটিয়া গেল; বলিল, "পারবি নে, ত খাবি কি? তোর বৌ খাবে কি?"

কিশোর বলিল, "সারা-জন্ম মোট খেটে খাব, সেও ভাল, তবুও এমন দিনে-ডাকাতি করব না।"

"তবে রে হারামজাদা, আমি ডাকাত! এত বড় কথা! বেরো আমার বাড়ী থেকে, নিয়ে যা তোর বৌকে। মোট খেটেই খাস্,—আমার বড় দিব্বি, তুই যদি আর বাঁক ঘাড়ে করিস্।"

নবীনের স্ত্রী গোলমাল শুনিয়াই বাহিরে আসিয়াছিল ; নবীন যখন এত বড় একটা দিব্বি গালিতে গেল, তখন সে বলিল "আরে, কর কি ? অমন দিব্বি কি করতে আছে ? তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি উড়ে গেল !

কিশোর দৃপ্তসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ, তাই হবে, আমি যদি নবীন ঘোষের ব্যাটা হই, তাহ'লে মোট বয়েই খাবো, গয়লার ব্যবসা আর করব না। গয়লার ভাত আর খাবো না।" এই বলিয়া কিশোর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২)

কতজন কত সাধিল, গ্রামের গোপবৃন্দ মজ্‌লিস করিয়া কিশোরকে কত অনুরোধ করিল, মাতা কত কাঁদিল ; অবশেষে পিতা নবীন ঘোষও বলিল, "ওরে ব্যাটা, রাগের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছি, আর তুই একমাত্র ছেলে, তুই সেই কথাটাই ধরে বস্‌লি। বাবা আমার, রাগ করিস্‌নে, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুই ঘরে ফিরে আয় এমন ক'রে পথে-পথে বেড়ান কি ভাল।"

কিশোর কিন্তু কোন কথাতেই গলিল না, তাহার সেই একই কথা —বাপের আজ্ঞা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না,—বাপের দিব্বি কি আর ফেরে।

তাহার মা একদিন পথের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত চাপিয়া ধরিল ; কিন্তু কিশোরের মন কিছুতেই নরম হইল না ; সে বলিল, "নবীন ঘোষের ব্যাটার যে কথা, সেই কাজ। এ জন্মে আমি মোট বয়েই খাব। বাপের কথা রক্ষা করে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন, আর আমি মোট বয়ে দুটো পেটের ভাত জোটাতে পারব না ?"

মা বলিল, "তুই যেন জোটালি, কিন্তু আর একজন যে আছে; আবার দুদিন পরে যখন কাচ্চা-বাচ্চা হবে, তখন কি করবি?"

কিশোর বলিল, "সে কথা তুমি ভেব না মা! জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি সে কথা একটুও ভাবি নে—একেবারেই না। বউয়ের কথা বল্‌ছ? তার ভাইকে খবর দিয়েছি; দুই এক-দিনের মধ্যেই তারা এসে নিয়ে যাবে। তার পর—যা করেন হরি!"

মা বলিল "সে কি হয় বাবা! আমরা ঘর করব কাকে নিয়ে? তোদের বনবাস দিয়ে কি ক'রে ঘরে মাথা দেব?"

কিশোর বলিল, "সে আর হয় না মা! আমাদের পেটের ভাতের জন্যে মোট বইতেই হবে। তুমি আর কিছু বলো না। মনে কর না কেন, তোমার ছেলে নেই, তোমার ছেলে মরে গেছে।"

"ষাট্, ষাট্, বাবা, অমন কথা বল্‌তে নেই। দেখ্ কিশোর, এরই জন্য কি তোকে মানুষ করেছিলাম। তুই কি আমাদের মুখের দিকে চাইবি নি?"

কিশোর কাতর বচনে বলিল, "সব করব মা। তোমাকে কি ফেল্‌তে পারি, বাবাকেই কি ফেল্‌ব। কিন্তু সেই এক কথা—মাথায় মোট বয়ে এনে তোমাদের খাওয়াব। ও-বাড়ীতে আর মাথা দেব না—বাপের আজ্ঞা।"

মাতা আর কিছু বলিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেল। কিশোর বাড়ী ছাড়িয়া, গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। তাহার স্ত্রী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল। নবীন ঘোষ মাথায় হাত দিয়া বসিল; তাহার স্ত্রী পুত্রশোকে শয্যাশায়িনী হইল; কিন্তু একদিনও সে স্বামীকে একটা কটু কথা বলিল না,—বলিতে পারিল না;—নবীনের

মুখের দিকে চাহিয়াই সাধ্বী বুঝিতে পারিত, কি প্রলয়ের অগ্নি তাহার বুকের মধ্যে অহরহ জলিতেছে!

নবীন বসিয়া বসিয়া ভাবিত, বাপে কি ছেলেকে বকে না, গালাগালি দেয় না, দুর-ছাই করে না। কিন্তু তাহার এ কি হইল। হায় ঠাকুর! এ কি করিলে! কি পাপে আমায় এমন শাস্তি দিলে দয়াল! নবীনের বুক ফাটিয়া যাইত।—ঐ বুঝি তাহার কিশোর ফিরিয়া আসিল—ঐ বুঝি তাহার পায়ের শব্দ। কিন্তু কোথায় কিশোর! সে যে কোথায় গেল, কেহই তাহার সন্ধান দিতে পারিল না।

(৬)

কিশোরের মাতা শয্যাগতা হইল; তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না। নবীন ঘোষ মহা বিপদে পড়িল। কাজ-কর্ম্ম ত যায়-যায় হইল; পীড়িতা স্ত্রীর শুশ্রূষা কে করে? সে তখন কিশোরের শ্বশুর-বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইল। কিশোরের শ্বশুর-শাশুড়ী মেয়েকে পাঠাইতে প্রথমে অস্বীকার করিল;—তাহারা সকল কথাই শুনিয়াছিল। নবীন ঘোষের কথাতেই কিশোর বিবাগী হইয়াছে; সেই নবীন ঘোষের বিপদের সময় তাহার সাহায্য করা তাহারা কর্ত্তব্য মনে করিল না! কিন্তু কিশোরের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার স্বামীই না হয় রাগ করিয়া দেশান্তরে গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া এই অসময়ে সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিবে না কেন? কিশোরই কি দেশে থাকিলে এ সময় রাগ করিয়া থাকিতে পারিত। না—তাহা হইতে পারে না। কিশোরের স্ত্রী জেদ করিয়া, তাহার ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রবধূকে পাইয়া কিশোরের মা কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল; কিন্তু তাহার শরীর আর ভাল হইল না;—ক্রমেই

সে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের কবিরাজ মহাশয় অনেক ঔষধ দিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে একদিন তিনি বলিলেন, "কি করিব, এ রোগ ত ঔষধে সারিবে না, এ যে মনের রোগ—ইহার চিকিৎসা নাই।"

তাহাই হইল;—দেড় মাস রোগে কষ্ট পাইয়া কিশোরের মা সকল দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। নবীন ঘোষ কাঁদিয়া বলিল, "ওরে কিশোর, একবার এসে দেখে যা; তোর মা তোরই শোকে চ'লে গেল। গিন্নি, আমারও আর দেরী নেই, তুমি যাও, আমিও যাচ্ছি। কিশোর, বাবা তোর মনে কি এই ছিল!"

নবীন ঘোষের কথাই ফলিল। সাত দিনও গেল না;—নবীন বিছানায় পড়িল। চিকিৎসাপত্রের ক্রটী হইল না; কিশোরের শ্বশুর এই বিপদের সময় অভিমান করিয়া থাকিতে পারিল না। সে বেহাই-বাড়ী আসিল। তাহার পরই একদিন তুলসীতলায় কিশোরের নাম করিতে-করিতেই নবীন ঘোষের দেহাবসান হইল। মরিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও নবীন ঘোষ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে কিশোর, আমি আমার দিব্বি ফিরিয়ে নিলাম বাবা!" তাহার পরই সব শেষ!

(২)

ইহার পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। নবীন ঘোষের বাড়ীতে যে কয়খানি ঘর ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে; আসবাবপত্র যাহা ছিল, তাহা গ্রামের দশজনে যে দিক দিয়া পাইয়াছে লইয়া গিয়াছে, নবীন ঘোষের ভিটা এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিশোরের স্ত্রীও বছরখানেক পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। গ্রামের লোক কিশোরের কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

পাঁচ বৎসর পরে এক দিন কিশোর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রথমেই তাহাদের বাড়ীর দিকে গেল। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দেখিল ঘরদ্বার কিছুই নাই; গুটি-তিনেক ভিটা পড়িয়া আছে, আর সমস্ত স্থানটা জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বেই একটা বটগাছ ছিল; কিশোর মাথায় হাত দিয়া সেই বটগাছের ছায়ায় বসিল, তাহার পুঁটুলিটি তাহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

কিশোর মনে করে নাই যে, তাহার বাড়ীর এই অবস্থা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবা কোথায় গেল? তাহার মা কোথায়? সে যে পিতামাতার চরণ দর্শন করিবার জন্য দেশে আসিয়াছে। তবে কি তাহারা বাঁচিয়া নাই? নিশ্চয়ই নাই, নতুবা বাড়ীর এ অবস্থা হইবে কেন? কিশোর একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহারই জন্য গৃহের আজ এ অবস্থা! তাহারই শোকে তাহার পিতামাতা অকালে দেহত্যাগ করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার উচ্চৈঃস্বরে বাবা, মা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদে। কিন্তু তখন তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না; তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গেল। সে সেই জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে একজন লোক সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আর কেহই নহেন, কিশোরদিগেরই পুরোহিত বৃদ্ধ রামতনু ভট্টাচার্য্য। পুরোহিত মহাশয় কিশোরের দিকে চাহিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে ও, কিশোর না?"

এই সম্বোধন শুনিয়া কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "কিশোর, কখন এলে? এমন কোরে এখানে বসে কেন?"

এইবার কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর বলিল, "ঠাকুর-মশাই, বাবা কেমন আছে, মা কোথায়? বাড়ীর এ হাল কেন?"

পুরোহিত বলিলেন, "তুমি বুঝি কোন সংবাদই রাখ না। তোমার পিতা এবং তোমার মাতা এবং——"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কিশোর বলিয়া উঠিল "ঠাকুর মশাই, এবং এরও সেই পথে যাওয়াই ঠিক ছিল; হাঁ, হাঁ, এবং-এরও সেই পথে যাওয়াই ঠিক ছিল।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "কিশোর অধীর হোয়ো না, পিতামাতা কাহারও চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না; তবে তোমার সঙ্গে তাদের শেষ সময় সাক্ষাৎ হইল না এটা ,বিশেষ পরিতাপের কথা বটে। তা কি করবে বল। শাস্ত্রেই আছে—নিয়তি কেন বাধ্যতে। তাদের নিয়তি ছিল এবং—"

কিশোর পুনরায় বাধা দিয়া বলিল, "ঠাকুরমশাই, আপনার নিয়তি এবং-কে রেখে গেল কেন?"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সে কথা পরে হবে, এখন চল, আমার বাড়ীতেই চল। তোমার নিশ্চয়ই স্নান-আহার হয় নাই; চল, বাড়ীতে চল। আগে স্নানাহার কোরে স্থির হও, তার পর সব কথা হবে, ওঠ।"

কিশোর আর কোন কথা না বলিয়া তাহার পুঁটুলিটা তুলিয়া লইয়া পুরোহিত-মহাশয়ের অনুসরণ করিল।

পুরোহিত মহাশয় বাড়ীতে পৌঁছিয়া কিশোরকে বলিলেন "কিশোর, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর পার, বিলম্ব করো না, স্নান ক'রে এস।"

কিশোর বলিল, "ঠাকুর-মশাই, এবং-এর ত আজ স্নান-আহার নেই। বাপ-মায়ের কোন কাজই ত এবং করে নাই, সে খবরও ত এবং—"

পুরোহিত-মহাশয় বলিলেন, "ও কি তুমি এবং-এবং করছ; পাগল হ'লে না কি?"

কিশোর বলিল, "যে পিতামাতাকে হত্যা করেছে, সে পাগল বই কি! তবে এবং-এর কথা এই যে, তার বাপ-মায়ের কোন কাজই তা হ'লে হয় নাই।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তা আর হয়েছে কৈ! কে করে? তোমার স্ত্রী যথাশাস্ত্র য-হয় তা না কি তার পিত্রালয়ে করেছিল। সেও ত বাঁচিয়া নাই; গত বৎসর সংবাদ পাইয়াছিলাম, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

কিশোর বলিল, "তাহা হইলে ঠাকুর-মশাই, এবং একেবারে নিশ্চিন্ত—একেবারে কোথাও কেউ নেই। যাক্, বাঁচা গেল, এবং তা হলে আজ উপবাসই করবে; কাল একটা শ্রাদ্ধশান্তি করাই চাই।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সে অতি উত্তম প্রস্তাব, পুত্রের উপযুক্ত কথাই বটে। তা হলে তুমি এখন বিশ্রাম কর, আমি স্নান-আহ্নিক শেষ করিয়া লই, তার পর একটা ফর্দ্দ করা যাবে।" এই বলিয়া পুরোহিত-মহাশয় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন; কিশোর সেখানেই বসিয়া রহিল।

(৮)

কিশোর নানা স্থানে কাজ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল; পাঁচ বৎসর পরে একবার জন্মভূমি, বাপমা, দুঃখিনী পত্নীকে দেখিবার ইচ্ছা হয়। তাই সে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার সকল বন্ধনই ছিঁড়িয়া গেল।

কিশোর পুরোহিত-মহাশয়ের হস্তে তাহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া বলিল, "ঠাকুর-মশাই এবং-এর কাছে আর কিছু নেই। এই দিয়েই বাপমায়ের কাজটা শেষ করে দিন; আর যদি পারেন, তাহ'লে সে পরের মেয়েটারও একটা পিণ্ডি দেবার যোগাড় করুন।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "কিশোর, সব টাকা যদি শ্রাদ্ধেই ব্যয় কর, তাহলে পরে কি হবে, সে কথা ত ভাবতে হয়! আমি বলি কি, কিছু খরচ ক'রে শ্রাদ্ধটা শেষ কর, আর বাকী টাকা দিয়ে বাড়ীতে দুই-একখানি ঘর তোল, আবার একটা বিবাহ কর, সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকরণা কর। বাপের নাম বজায় থাক!"

কিশোর বলিল, "ঠাকুর-মশাই তা আর হয় না, এবং সে পথে আর যাবে না। যে কয় দিন দেবতা বাঁচিয়ে রাখবেন, কোন মতে দিন কেটে গেলেই হয়। ও সব আদেশ আর করবেন না। এবং ও-পথে আর যাচ্ছে না।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তুমি ও কি এবং আরম্ভ করলে। মাথা খারাপ হ'য়ে গেল না কি?"

কিশোর বলিল, "না, ঠাকুর, বাপমায়ের নামও নেওয়া হবে না, বাপমায়ের দেওয়া নামও আর না; এ দাস এখন এবং।"

পুরোহিত মহাশয় বুঝিলেন, কিশোরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরদিন যথারীতি কিশোর তাহার বাপমায়ের এবং তাহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিল।

(৬)

গ্রামের লোক আর কিশোরের নাম ধরিয়া ডাকে না, সকলেই বলে 'এবং'। কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের বাহিরের ঘরের এক পার্শ্বে থাকে; সে মুটের কাজ করে। কিন্তু সে তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও উপার্জ্জন করে না।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সে নিকটবর্ত্তী হাটে যায়। হাটের অনতিদূরে একটা খাল। হাটে যাহারা জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদের অনেকেই দূরস্থান হইতে নৌকায় বোঝাই দিয়া জিনিষপত্র লইয়া আসে। কিশোর নৌকা হইতে তাহাদের বোঝাগুলি হাটে পৌঁছাইয়া দেয়; কিন্তু সে অধিকক্ষণ বোঝা বহে না; আটটী কি দশটী পয়সার মত কাজ হইলেই সে আর বোঝা মাথায় করে না, বলে "এবং আর বোঝা বইছে না; এই পেটের বোঝা নামে না, তাই বোঝা বইতে হয়।"

কেহ যদি বলে "বিপদ-আপদ; রোগ-ভোগ ত আছে, তখন কি হবে?"

কিশোর হাসিয়া উত্তর দেয়, "তখন এবং-এর বোঝা বইবার লোক আছে গো—লোক আছে। এবং আর বোঝা ভার করছে না।"

আট দশটি পয়সা পাইলেই সে হাট হইতে যাহা ইচ্ছা হয় কিনিয়া লইয়া পুরোহিত-মহাশয়ের বাড়ীতে যায়! কোন দিন বা রান্না করিয়া খায়, কোন দিন বা চিড়া-মুড়কি কিনিয়া আনিয়া তাহাই

আহার করিয়া দিন কাটায়। পুরোহিত মহাশয় কতদিন কিশোরকে প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন; কিন্তু সে কিছুতেই প্রসাদ গ্রহণ করিত না; বলিত "এবং বোঝা বইতে এসেছে, বোঝা বইবে আর খাবে—বসে-বসে খাবে না।"

সারাদিন কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের বাহিরের ঘরের এক প্রান্তে শয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সে একবার তাহার সেই পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইবেই;—কিছুতেই তাহার সে কার্য্যে বাধা দিতে পারিত না; ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, কিশোর একবার সেই তাহার পৈতৃক বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইত এবং করযোড়ে কি ভাবিত; তাহার পর আভূমি প্রণত হইয়া সে গান ধরিত—

"ওরে দিন ত গেল, সন্ধ্যা হোলো,
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা,
ডাক্‌ছি হে তোমারে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া উঠিত, তখন প্রতিদিন প্রতিবেশীরা কিশোরের কণ্ঠনিঃসৃত এই সুন্দর গান শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। কিন্তু তাহার পর, অন্য সময়ে যদি কেহ তাহাকে গান গায়িতে বলিত, তাহা হইলে সে বলিত, "এবং কি গান জানে? ঐ একটাই সে জানে—তা তোমরা শুনে কি করবে?"

কিশোরকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত। পুরোহিত মহাশয় ও তাঁহার বাড়ীর সকলে বলিত, কিশোর রাত্রিতে মোটেই নিদ্রা যায় না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া জপ করে; কখন হাসে, কখন কাঁদে; কেহ যদি

সেই সময় ডাকে, অমনই সে আত্ম-সংবরণ করে—কিছুতেই সে তাহার সাধন-ভজনের কথা কাহাকেও বলে না। পুরোহিত মহাশয় সকলের নিকটই গল্প করিতেন যে, কিশোরের সঙ্গে দেবতাদের কথা হয়, তাই কিশোর অমন হয়ে গিয়েছে। কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া বলে, "এবং মোট খাটতে এসেছে, মোট খাটে; দেবতার সঙ্গে তার কি? তবে বোঝা বইবার কথা বলচ। তা এবং-য়ের বোঝা বইতে হবে না? খুব হবে—আলবৎ হবে!"

এমনই ভাবে অনেকদিন চলিয়া গেল; গ্রামের সকলে কিশোরকে শুধু ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে। গ্রামে কাহারও কোন বিপদ হইলে কিশোর বুক দিয়া পড়ে প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা করে; সকলেই সেইজন্য তাহার অনুগত। কিন্তু কিশোর কোন দিন কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে না।

(৭)

একদিন প্রাতঃকালে কিশোর যথানিয়মে হাটে গেল, কিন্তু সেদিন আর সে মোট মাথায় করিল না। দোকানদারেরা যখন কিশোরকে মোট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে হাসিয়া বলিল, "এবং আর মোট বইবে না; সে আজ বোঝা নামিয়েছে।"

একজন বলিল "সেকি কিশোর!"

কিশোর বলিল, "আজ এবং-য়ের বোঝা বওয়া শেষ হয়েছে। অনেক দিনের বোঝা আজ নেমে গেছে গো! তোমরা আজ বেলা বারটার সময় ঘাটে এস, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল।"

আর একজন দোকানদার হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ কিশোর, আজ বারটার সময় কিসের নিমন্ত্রণ?"

কিশোর বলিল, "ওগো, বুঝতে পারছ না, আজ এবং বোঝা নামিয়েছে; বেলা বারটার সময় এবং বোঝা বিসর্জ্জন দেবে, তোমরা সবাই এস গো!"

সকলেই মনে করিল, কিশোর তামাসা করিতেছে; দুই একজন সে কথা বলিল। কিশোর বলিল, "তামাসা নয় ভাই, তামাসা নয়, এবং আজ তার সব বোঝা ঘুচিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে; আর কি সে বোঝা বয়। তার যে ডাক পড়েছে।" কেহই কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিল না।

এদিকে কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে বলিল, "ঠাকুর, আজ দুপুর বেলা আপনাকে একবার খালের ধারে যেতে হবে।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "দুপুর বেলা খালের ধারে কেন কিশোর?"

কিশোর বলিল, "একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে ঠাকুর। এবং আজ বোঝা নামাবে।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তোমার কথা ত কিছুই বুঝতে পারলাম না কিশোর।"

কিশোর বলিল, "সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন ঠাকুর-মশাই।" এই বলিয়া কিশোর সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল এবং অনুচ্চস্বরে কি বলিতে লাগিল। পুরোহিত-মহাশয় কিশোরের এ ভাব জানিতেন; সুতরাং তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

বারটা বাজিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কিশোরের ধ্যান ভঙ্গ হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুরোহিত মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া ডাকিল, "ঠাকুর মশাই, আসুন; বেলা যে হয়ে এল।"

পুরোহিত-মহাশয় বলিলেন, "কিসের বেলা কিশোর ?"

কিশোর বলিল, "এবং-য়ের বোঝা নামাবার সময় যে হয়ে এল, আপনি আসুন, একটু পায়ের ধূলো যে দিতে হবে ঠাকুর !"

পুরোহিত ঠাকুর আব কি করেন ; ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, কিশোর তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

তাহারা খালের ধারে উপস্থিত হইল। তখনও হাট ভাঙ্গে নাই। কিশোর তখন বলিল. "ঠাকুর মশাই, তবে এবং বোঝা নামাক্ ?"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন "তোমার অভিপ্রায় কি, তাহা ত বুঝতে পারছি নে কিশোর !"

কিশোর আর কোন কথা বলিল না ; ধীরে ধীরে পুরোহিত ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিল. তাহার পর সে জলে নামিল। তামাসা দেখিবার জন্য হাটের লোক তখন খালের ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। কিশোর জলে দাঁড়াইয়া এক গণ্ডুষ জল মাথায় দিল। তাহার পর একবার সে চীৎকার করিয়া বলিল, "হরিবোল"—তাহার পরই একেবারে চুপ !

তখন সকলে ধরাধরি করিয়া কিশোরের দেহ তীরে তুলিল ;—দেখিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে,—কিশোর সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে।

এখনও লোকে সেই ঘাটের নাম 'এবং ঘাট' বলিয়া থাকে।

মোহিতের পরিণাম।

মোহিত আর আমি একই বৎসরে আমাদের গ্রামের ইংরাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন দেখা গেল, মোহিত তৃতীয় বিভাগে গিয়াছে এবং আমি প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি। মাষ্টার-পণ্ডিত সকলেই বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই একটা বৃত্তি পাইব; আমার মনে কিন্তু সে আশার উদয় হয় নাই। আমার মতন হতভাগ্যের অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হইবে?

আমার অদৃষ্ট যদি মন্দ না হইবে, তাহা হইলে যখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, যখন সংসারে আমার আর কেহ ছিল না, সেই সময় হঠাৎ বাবা মারা যাইবেন কেন? জ্যেঠা নাই, খুড়া নাই, মামা নাই, বড় ভাই নাই, এমন কি একজন ভগ্নীপতিও নাই, এমন অবস্থায় মা, বিধবা দিদি এবং আমাকে ফেলিয়া বাবা অকালে স্বর্গে চলিয়া যাইবেন কেন?

তবে এ কথাও বলি, বাবা আমাদিগকে একেবারে পথে বসাইয়া যান নাই। আমাদের সামান্য যে জোতজমা ছিল এবং এখনও আছে, তাহাতে এই ছোট পরিবারের মোটা ভাত মোটা কাপড় চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে আমার ভবিষ্যৎ পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

বাবার মৃত্যু হইলে আমি মনে করিয়াছিলাম, আর আমার পড়া চলিবে না। কিন্তু মা বলিলেন, "তোর ভয় কি? তোর

লেখাপড়ার ভাবনা নাই। না হয় ভিক্ষা করিব, তবুও তোকে পড়াইব।" মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল, সেই সাহসেই তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন।

যাহা হউক প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া আমার উৎসাহ খুব বৃদ্ধি হইল। হেড মাষ্টার বলিলেন "বৃত্তি পাইলে তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইও।" আমি বলিলাম "যদি না পাই।" তিনি বলিলেন "পাবে হে, পাবে।" আমি ঠিক জানিতাম যে, আমার অদৃষ্টে বৃত্তি পাওয়া নাই।

তাহাই হইল; আমি বৃত্তি পাইলাম না। মা বলিলেন "না পেলি টাকা, আমি তোকে মাসে-মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেব, তুই কলেজে পড়তে যা।"

আমি বলিলাম "পড়ব ত ঠিক, কিন্তু কলেজে নয়; আমি ডাক্তারী পড়ব।"

বন্ধুবান্ধব আমার এই কথা শুনিয়া ছি. ছি, করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিলেন "ফাষ্ট ডিবিসনে পাশ ক'রে কি না ক্যাম্বেলের ডাক্তার হ'তে যাবে।" কাম্বেলের ডাক্তার যেন মানুষ নয়!

আমি মাকে বলিলাম "দেখ. কলেজে অনেক দিন পড়তে হবে, তাতে খরচও অনেক। তার পর পাশ হব, না হব, তার ঠিক নেই। আর ধর যদি বি-এ এম-এই হই, তা হলেই বা কি হবে? এখনকার দিনে মুরুব্বী না থাকলে শুধু পাশে কিছু হয় না। তোমার হাতে ত রাজার ভাণ্ডার নাই যে, দুহাতে দুদশ বছর খরচ করবে। তার থেকে আমি ক্যাম্বেলে ডাক্তারি পড়ি, তিন বছরেই পড়া শেষ হবে। পাশ যদি করতে পারি, তা হ'লে ত ডাক্তারই হয়ে পড়ব; আর পাশ যদি না

করি, তা হ'লেও চিকিৎসাপত্র করে দুপয়সা আন্‌তে পারবই। কলেজে পড়ে তা হবার যো নেই।" মা আমার কথা বুঝিলেন, আমার ক্যাম্বেলে পড়াই স্থির হইল।

মোহিত আর আমি এক-বয়সী; কিন্তু বয়স সমান হইলে কি হয়, মোহিত আমার অপেক্ষা চালাক-চতুর; মোহিত দশমুখে কথা বলিতে পারিত; মোহিত খবরের কাগজ পড়িত; মোহিত বুয়ার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ বলিতে পারিত; মোহিত না কি কবিতাও লিখিতে পারিত। আর আমি,—আমি না হয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগেই পাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়গুলির পরীক্ষা লইয়া যদি পাশ-ফেল হইত, তাহা হইলে মোহিত প্রথম বিভাগে, এমন কি প্রথম দশজনের একজন হইত, আর আমি সমস্ত বিষয়ে ঢেঁড়া-সহি হইতাম। আমি একে বাঙ্গাল, তায় পাড়াগেঁয়ে, তার উপর আবার মুখচোরা—একেবারে সোণায় সোহাগা!

(২)

মোহিতের সঙ্গে যখন আমার কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল, তখন সে আমাকে তালিম দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, "দেখ্, কোল্‌-কাতায় গিয়ে এমন অসভ্যের মত থাক্‌লে তুই সেখানে টিক্‌তেও পারবি নে। এখন থেকেই কথাবার্ত্তা কোল্‌কাতার মত বল্‌তে অভ্যাস কর। আমি তোকে কতদিন বলিনি যে, 'করতাম' 'খাতাম' বলিস্‌নে, 'কর্ত্তুম' 'খেতুম' বলা অভ্যাস কর। তুই তখন হেসেই উড়িয়ে দিতিস। এখন কোল্‌কাতায় গিয়ে যদি ঐ রকম কথা বলিস্, কোঁচার কাপড় কোমরে জড়িয়ে, খালি গায়ে থাকিস্, তা-হলে কোন মেসেই তোকে স্থান দেবে না; আমি ও তা-হ'লে তোর সঙ্গে এক মেসে থাক্‌তে

পারব না। কোল্‌কাতায় খুব ফিট্‌ফাট হ'য়ে থাক্‌তে হয়, নইলে ভারি বিপদ ; সে কথা কিন্তু আগেই ব'লে রাখ্‌ছি। তুই ত আগে আর কখন কোল্‌কাতায় যাস্‌নি, আমি কতবার গিইছি ; তাই আমার কথা শুধরে গেছে, আমি সেখানকার চাল-চলন সব শিখে নিয়েছি ; এত দিন যারা আমায় ঠাট্টা করত, কলকাতাই ব'ল্‌ত, তারা এখন গিয়ে যেন দেখে নেয়, আমার কেমন সুবিধে হয়েছে, আর তোর কত অসুবিধা পোয়াতে হচ্ছে।"

মোহিতের কথা শুনিয়া সত্যসত্যই আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। একে কখন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাই নাই, তাহার পর মোহিত যে প্রকার ভয় দেখাইয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল, হয় ত আমাকে কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই আসিতে হইবে, সেখানে পড়া-শুনা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। শেষে মনে হইল, আমার মত বাঙ্গাল কি কেহ কলিকাতায় পড়িতে যায় না ? আমি তখন মোহিতকে বলিলাম "ভাই, তোর সঙ্গেই ত যাইব, তুই আমাকে যেমন-যেমন করতে বলবি, আমি তাই করব।"

মোহিতকে যে আমি মুরুব্বী ধরিলাম, ইহাতে সে বড়ই আনন্দিত হইল। সে বলিল "তা, তোর কোন ভয় নেই, তোর সব ক্রটী আমি সেরে নেব।"

যথাসময়ে মা ও দিদিকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মোহিতের সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। মোহিতের মামা সিটি কলেজে বি-এ পড়িতেন, তিনি ষ্টেশন হইতে আমাদিগকে তাঁহার মেসে লইয়া গেলেন।

তাহার পর বহুবাজার অঞ্চলে আমাদের জন্য একটা মেসের

অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম, "যে মেসে আমাদের দেশের ছেলে বেশী আছে, সেই রকম একটা মেসে গেলে ভাল হয়।" আমার কথা শুনিয়া মোহিত রাগিয়া উঠিল; সে বলিল "বাঙ্গালদের সঙ্গে এক মেসে আমরা থাক্‌ব না।"

আমি বুঝিলাম, কলিকাতায়, ত্রিরাত্রি না যেতেই মোহিত কলিকাতাওয়ালা সহুরে হইয়া গিয়াছে, আর আমরা সবাই বাঙ্গাল হইয়া গিয়াছি। কি করিব, তাহাকে কর্ণধার করিয়া যখন কলিকাতা-রূপ আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের খেয়ায় উঠিযাছি, তখন সে যদি গাযে একটু জল ছিটাইয়াই দেয়, তাহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে।

মোহিত ও তাহার মামা মেস খুজিতে বাহির হইত, আমাকে সঙ্গে লইত না; যাইতে চাহিলে বলিত "তুই ছেলেমানুষ, পাড়াগেঁয়ে, তুই সহরের কি জানিস্।" ব্যস, চুপ। মোহিত একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে আমার তিন মাসের ছোট, এবং সে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর আমি প্রথম বিভাগে। সে আমাকে নিতান্ত নাবালক ও নালায়েকের দলে ফেলিয়া দিল। স্কুলে পড়িবার সময় পণ্ডিত মহাশয় যখন-তখন বলিতেন 'বয়সেতে বৃদ্ধ হয় না, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।' এ ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইলাম।

অনেক অনুসন্ধানের পর হুজুরিমলের ট্যাঙ্ক লেনে একটা মেস পাওয়া গেল। সেই মেসের একটা ঘরই খালি ছিল; তাহাতে দুইজনের থাকিবার কথা। মোহিত না কি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল যে, সে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকিবে না; এক মেসে সে থাকিতে সম্মত হইয়াছে, সে কেবল আমি তাহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম বলিয়া। কিন্তু সে মেসে অন্য ঘরে কোন স্থান খালি ছিল না, অগত্যা

তাহাকে আমার সঙ্গে একমেসে একই ঘরে থাকিতে হইল। মোহিত বঙ্গবাসীতে ভর্ত্তি হইল, আমি শিয়ালদহের ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে প্রবিষ্ট হইলাম।

মা তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে প্রতি মাসে আমাকে কুড়িটী টাকা পাঠাইতেন। প্রথম আসিবার সময় পুস্তক ও জিনিসপত্রাদি কিনিবার জন্য অতিরিক্ত ৫০টী টাকা দিয়াছিলেন। স্কুলের বই কিনিতেই তাহার অর্দ্ধেকের অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। আমি যখন বই কিনিতে আরম্ভ করিলাম, তখন মোহিত একদিন আমাকে বলিল "এক-সঙ্গে এত বই কেন কিন্‌চিস্; যখন যে বই পড়া আরম্ভ হবে, তখন সেইখানি কিন্‌লেই হবে। এখন অন্যান্য অনেক খরচ আছে।"

আমি বলিলাম "অন্য খরচ আর কি? কাপড়-চোপড় যা বাড়ী থেকে আনিয়াছি, তাহাতেই চলিয়া যাইবে, বিছানাপত্রও আনিয়াছি, থালা-গ্লাসও আনিয়াছি। এখন আর চৌকী কিনিব না; দোতলার ঘর, একটা মাদুর কিনিয়া লইলেই হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া মোহিত রাগিয়া অস্থির হইল; সে বলিল, "ঐ জন্যই ত তোর সঙ্গে এক ঘরে, এক মেসে থাক্‌ব না ব'লেছিলাম। বাড়ী থেকে যে কাপড়-জামা এনেছিস্, তা যদি এখানে ব্যবহার করিস্, তা হ'লে তোকে স্কুলে বস্‌তেই দেবে না। ঐ চটি জুতো পায়ে দিয়ে বুঝি স্কুলে যাবি। কোল্‌কাতায় যদি থাক্‌তে হয়, তা, হ'লে আমি যা বলি, তাই কর্। আমার সঙ্গে চল, ভাল দেখে জামা কিনে দিই, কোট কিনে দিই, বুট জুতো কিনে দিই। তার পর আয়না, বুরুস, চিরুণী কিন্‌তে হবে, তোয়ালে কিন্‌তে হবে, সাবান কিন্‌তে হবে, রুমাল কিন্‌তে হবে। এ সব চাই; কোল্‌কাতায়

থেকে পড়াশুনা কোরতে হ'লে এ সব আগে চাই; বই দুই একখানা চেয়ে-চিন্তেও চলে, এ সব ত আর চেয়ে পাওয়া যায় না। তারপর, জানিস্, একটু চালাক-চতুর হ'তে হবে, থিয়েটার দেখ্‌তে যেতে হবে; যেখানে-যেখানে সভা হবে, লেক্‌চার হবে, তা সব শুন্‌তে যেতে হবে। এ সব না ক'রলে লেখাপড়াই হয় না। এই ত কয় দিন এসেছিস্, এর মধ্যে ছেলেদের চাল-চলন দেখেও কি বুঝ্‌তে পারলি না?"

আমি সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম "ভাই মোহিত, তোমাদের অবস্থা ভাল, তোমরা ও-সবে খরচ করতে পার। আমি গরিব মানুষ; আমার কি ও-সমস্ত পোষায়। তা, তোমাদের যদি অসুবিধা বোধ হয়, তাহা হইলে আমি দেখে-শুনে আমার মত গরিবের ছেলেরা যেখানে থাকে, সেই রকম একটা মেসে যাব।"

মোহিত রাগিয়া বলিল "বেশ, সেই ভাল। আমি তা হ'লে বাঁচি।'

তাহার পর কুড়ি বাইশ দিন মোহিতের সঙ্গে এক মেসে ছিলাম, পরে শিয়ালদহের অতি নিকটে আর একটী মেসে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের অঞ্চলের কয়েকটী ছাত্র ছিলেন; সকলেই ডাক্তারী পড়িতেছেন, এবং সকলেই প্রায় আমার মত গরিব। আমি যে তিন বৎসর কলিকাতায় ছিলাম, এই এক মেসেই কাটাইয়াছিলাম।

মোহিতের সঙ্গ ছাড়িয়া আসিবার পর সে যদিও কোনদিন আমার সংবাদ লয় নাই, আমি কিন্তু সর্ব্বদাই তাহার খোজ লইতাম। তাহার সহিত দেখা হইলে সে মুরুব্বীগিরি করিতে ছাড়িত না। বিশেষ সে তখন নাকি দশজনের একজন হইয়াছিল। মাথায় লম্বা চুল রাখিয়াছিল, (তখন তাহাই ফ্যাসান ছিল) চসমা পরিয়াছিল, সিঁথি কাটিত, এসেন্স

মাখিত ;—এক-কথায় বাবু হইবার জন্য যাহা কিছু সরঞ্জাম, তাহা সমস্তই সে সংগ্রহ করিয়াছিল। শনিবার ও রবিবারে যথানিয়মে থিয়েটারে যাইত, আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্রপাত হইলেও তাহার থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ হইত না। যেখানে যখন যে হুজুগ হইত, মোহিত তাহাতেই যোগ দিত। সে আর সবই করিত, কিন্তু যে জন্য কালকাতায় গিয়াছিল, সেই পড়াশুনাই করিত না।

তখন কলেজে উপস্থিত-অনুপস্থিতের কোন হাঙ্গামা ছিল না ; দুই বৎসর রেজেষ্টরী-বহিতে নাম রাখিতে পারিলেই এল-এ পরীক্ষা দেওয়া যাইত। মোহিত কলেজে যাক্ আর নাই যাক্, পড়ুক আর না পড়ুক, দুই বৎসর কলেজে বেতন যোগাইয়াছিল, সুতরাং দুই বৎসর পরে তাহার পরীক্ষা-প্রদানের কোন প্রতিবন্ধক হইল না ; তাহার পিতা তাহাকে মাসে মাসে যে টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে কি মোহিতের মত বাবু লোকের কলিকাতার খরচ চলে ? সে মধ্যে-মধ্যে নানা কথা বলিয়া বাড়ী হইতে কিছু কিছু অতিরিক্ত আনাইত, কিন্তু তাহাতেও তাহার কুলাইত না। আমার নিকট সে কোন দিন টাকা ধার করিতে আসে নাই, কারণ সে জানিত, আমার বাড়ী হইতে যাহা আসে, তাহার একটী পয়সাও বাঁচে না। সে অন্যান্য ছাত্রের নিকট ধার করিত, মেসের ঝির নিকট তাহার অনেক টাকা ধার হইয়াছিল, যে লোকটা জলখাবার দিত তাহার নিকটও ধার হইয়াছিল। সে কাহারও টাকা সহজে শোধ দিত না, সেই জন্য একস্থানে দুইবার ধার করা তাহার পক্ষে সহজ হইত না।

পরীক্ষার পর আমার সঙ্গে যখন তাহার দেখা হইল, তখন তাহাকে বাড়ী যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে বলিল "বাবা, ঐ ম্যালেরিয়ার

মধ্যে যাইয়া কি প্রাণ হারাইব?" মোহিত বাড়ীতে গেল না! পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, গেজেট খুঁজিয়াও তাহার নাম পাওয়া গেল না;— পড়াশুনা করিলে ত পাশ হইবে?

আমি মনে করিয়াছিলাম, একবার ফেল হইয়া হয় ত মোহিতের জ্ঞান হইয়াছে, সে হয় ত পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। বাহিরে আমার কথাই ঠিক থাকিল; মোহিতের পিতা আর এক বৎসর তাহার পড়ার খরচ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু মোহিত আর কলেজে নাম লিখাইল না; বাড়ীতে সকলে জানিতে লাগিল মোহিত পড়াশুনাই করিতেছে, কিন্তু মোহিত কলেজ ছাড়িয়া দিল। মাসে মাসে বাড়ী হইতে টাকা আসে, মোহিত বাবুগিরিতে সে টাকা উড়াইয়া দেয়। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, মোহিতের না কি স্বভাবচরিত্রও বিগড়াইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে একদিন মোহিতের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে, আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় কয়েকটী বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছি এবং আমাকে কলেজের বেতনও দিতে হয় না। মোহিত আমাকে দেখিয়া বলিল "ওরে, তুই নাকি বৃত্তি পেয়েছিস্, বেশ—বেশ! আর একটী বছর গেলেই ডাক্তার আর কি! তা দেখ্ এখন ত তোর টাকাকড়ির অভাব নেই, আমাকে দশটী টাকা হাওলাত দিতে পারিস্, আমি মাইনে পেলেই তোর টাকা দিয়ে যাব।"

আমি বলিলাম "মাইনে কি? তুমি চাকুরী কোরছ না কি?"

মোহিত বলিল "ওহো! সে খবর তোকে বুঝি দিই নেই, আমি যে বেঙ্গল থিয়েটারের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হয়েছি; মাসে ৬০৲ টাকা

পাই ; দু'চার মাস পরেই ম্যানেজার হব আর কি। তখন ১০০৲ টাকা মাইনে হবে, আর অংশ পাব। তুই একদিন থিয়েটারে যাস, তোকে 'বক্সে' বসিয়ে প্লে দেখাব।"

আমি বলিলাম "আজ দুই বছর হ'য়ে গেল, কোন আমোদ দেখতে যাই নাই ; শেষ পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্, তাপর সে সব দেখা যাবে ; এখন কি আব সময় আছে ?"

মোহিত বলিল "তা বেশ, বেশ, তাই হবে। চল্ তোর সঙ্গে যাই, আমার দশটা টাকার খুবই দরকাব। যেদিন মাইনের টাকা পাব, সেই দিনই তোর টাকা আগে দিয়ে যাব, বড় বেশী হয় ত আট নয় দিন।"

আমি বলিলাম "ভাই, আমার অবস্থা ত জান, মা তাঁর জমা টাকা ভেঙ্গে আমার খরচ দিতেন। এবার বৃত্তি পাওয়ার পর হইতে মার নিকট থেকে আব খরচ আনাই নে। বৃত্তির টাকা পাই, তাই দিয়েই চালাই। কাজেই আমার হাতে একটা পয়সাও থাকে না।"

মোহিত ছাড়িবার পাত্র নয় ; সে বলিল "তোর কাছে না থাকে, মেসের কোন ছেলের কাছ থেকে ধার ক'রে দে, আমি ঠিক আট দশদিন পরে দিয়ে যাব।"

আমি বলিলাম "সে হবে না ভাই, ধারকে আমি বাঘের মত ভয় করি। আমি কোন দিন ধার করি নাই, কখন ধার কোরবো না, ভিক্ষা করতে হয়, সেও ভাল।"

মোহিত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল "দিবিনে তাই বল্, অত কথার দরকার কি ?" এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

আমাদের মেসে আমার সতীর্থ একটী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার

থিয়েটার দেখিবার খুব বাতিক ছিল। তাঁহাকে মোহিতের কথা বলিলাম। তিনি হাসিয়াই অস্থির; শেষে বলিলেন "তুমিও যেমন, মোহিত বাবু ম্যানেজার না আরও কি! তিনি থিয়েটারের টিকিট কালেক্টর। যে কয়দিন থিয়েটার হয়, সেই কয়দিন দুয়ারে দাঁড়াইয়া টিকিট লন। শুনিয়াছি, এই কাজের জন্য তিনি সপ্তাহের ঐ তিন দিন আট আনা হিসাবে পারিশ্রমিক পান, আর থিয়েটার দেখা উপরি লাভ। আর যা করেন, তা আর শুনে কাজ নাই।" এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক্! মোহিতের যে এতদূর অধঃপতন হইবে, তাহা কোন দিনই ভাবি নাই; তাহার জন্য বড়ই দুঃখ হইল।

মাস দুইয়ের মধ্যে মোহিতের আর কোন সংবাদ পাইলাম না। একদিন রবিবার রাত্রি প্রায় একটার সময় আমার উপরিউক্ত বন্ধুটী থিয়েটার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন "শুনেছ, তোমাদের মোহিত আজ কি কীর্ত্তি করেছে?"

আমি বলিলাম "ব্যাপার কি?"

তিনি বলিলেন "আর ব্যাপার! একেবারে পিক-পকেট (pick pocket)। একটী ভদ্রলোক থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছিলেন। তিনি যখন দুয়ার দিয়া ভিতরে যাইতেছিলেন, মোহিত তখন তাঁহার পকেট হইতে টাকশুদ্ধ রুমালখানি তুলিয়া লইয়াছিল। আর একটী লোক তাহা দেখিতে পাইয়া তখনই মোহিতকে ধরিয়া ফেলেন। মহা গণ্ড-গোল! আমরা সকলে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিবার জন্য কত অনুরোধ করিলাম; ভদ্রলোকটীও সম্মত হইলেন, ; কিন্তু থিয়েটারের কর্ত্তারা সে কথা শুনিলেন না। তাঁহারা মোহিতকে পুলিশের জিম্বা করিয়া দিলেন। তাহাকে তখনই থানায় লইয়া গিয়াছে।"

মোহিতের এই কুকার্য্যের কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। সে রাত্রিতে আর কি করিব? পরদিন সকাল-সকাল লালবাজার পুলিশ কোর্টে গেলাম, সঙ্গে কিছু টাকাও লইয়া গেলাম; যদি তাহার বিশ পঁচিশ টাকা জরিমানা হয়, তাহা হইলে তাহা দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া আনিব।

পুলিশ-কোর্টে যাইয়া চারি টাকা দিয়া দিয়া একজন উকিল নিযুক্ত করিলাম। যথাসময়ে মোহিতের মোকর্দ্দমা উঠিল। সে যে পকেট মারিযাছিল, তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। উকিল বাবু মোহিতের প্রতি দয়া করিবার জন্য বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিচারক মহাশয় তাহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। মোহিত ছলছল নেত্রে একবার আমার দিকে চাহিল। তাহার পরই আদালতের লোকেরা তাহাকে গারদে লইয়া গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা। কারাগার হইতে বাহির হইয়া মোহিত যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারে না।

বড়-দিদি।

তোমাদের মা আছে, বাপ আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, বন্ধুবান্ধব আছে ;—তোমাদিগকে কেমন করিয়া বুঝাইব বড়-দিদি আমার কে ?

এ সংসারে আমি শ্রীঅনাথবন্ধু মিত্র, আমার কেহ নাই—সত্যসত্যই কেহ নাই—আছেন কেবল এক বড়দিদি। তুমি যখন মা বলিয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হও, আমি তখন ভাবি মা আবার কে ? মা ত বড়-দিদি। তোমরা মা বলিয়া যে আনন্দ পাও, আমি দিনান্তে পরিশ্রান্ত দেহে বাড়ীতে আসিয়া "বড়দি" বলিয়া তাহার অধিক আনন্দ, ততোধিক শান্তি পাই। বড়-দিদি আমার সব ; এ সংসারে আমি জানি এক বড়-দিদি। আর কাহারও অভাব কোন দিন আমার মনে হয় নাই।

আমার বয়স এই ২৩ বৎসর। কলিকাতা সহরে আমাদের বাড়ী। বাড়ীতে থাকেন বড়-দিদি, আর থাকি আমি। বুদ্ধি হইয়া অবধিই বড়-দিদিকে দেখিতেছি ; তোমরা মায়ের নিকট যে স্নেহ, আদর পাও, ভাইয়ের নিকট যে ভালবাসা পাও, ভগিনীর নিকট যে আনন্দ পাও, আমি এক বড়দিদির নিকট সে সমস্তই পাই। আমার এই ক্ষুদ্র সংসার বড়-দিদিময়। বড়-দিদির কথা ব্যতীত আর কোন কথা আমার নিকট বড় বলিয়া মনে হয় না। আমার বড়-দিদির কথা তোমরা শুনিবে ?

বড়-দিদির মুখে গল্প শুনিয়াছি, বিবাহের তিন মাস পরে তিনি

বিধবা হন। তখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর; আমার তখন জন্ম হয় নাই। তাহার তিন বৎসর পরে আমি যখন মাতৃগর্ভে, তখন আমার পিতা স্বর্গে যান। তাহার পর আমার জন্মের এগার দিন পরেই মাতাঠাকুরাণী পিতার নিকট চলিয়া যান। সংসারে ১৬ বৎসরের মেয়ের নিকট এগার দিনের ছেলেকে রাখিয়া মা চলিয়া গেলেন।

বাবার বড়বাজারে একটা ছোট কাপড়ের দোকান ছিল। কাপড়ের দোকানের আয় যাহা ছিল, তাহাতে আমাদের সংসারযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইত। বাবা কিছু টাকাও জমাইয়াছিলেন। চোর-বাগানের বাড়ীখানিতে আমরা বাস করিতেছি; ইটালীতে আর একখানি বাড়ী আছে, তাহার ভাড়া মাসে ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়।

বাবার মৃত্যুর পরেই বড়-দিদির দেবর আসিয়া আমাদের বিষয়-কর্ম্মের বব্যস্থা করিতে চান। কিন্তু বড়-দিদির বয়স তখন ১৬ বৎসর হইলেও তিনি সেই অযাচিত অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, নিজেই চেষ্টা করিয়া দোকানখানি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। দোকানের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আর ইটালীর বাড়ীর ভাড়া আমাদের দুইটি মানুষের এই সংসার-যাত্রার পাথেয় ছিল। এ সকল কথা আমি দিদির মুখে শুনিয়াছি।

তাহার পর আমি এই এত বড় হইয়াছি, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়াছি, জন মর্লিংটন কোম্পানীর বাড়ীতে ৮০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করি, এ সমস্তই বড়-দিদির কৃপায়।

আমার জীবন-কাহিনী বলিবার জন্য বসি নাই; আমার জীবনে এমন কিছু ঘটে নাই, যাহা বলিতে পারি। বড়-দিদির জীবনের একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। বড়-দিদির মুখেই কথাটি শুনিয়া-ছিলাম। তিনি কেন যে সে কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা জানি না।

বড়দিদির বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন আমাদের পাশের বাড়ীতে কতকগুলি আফিসের বাবু একটা মেস খুলিয়াছিলেন। একে মেস, তাহাতে অল্প-বেতনভোগী আফিসের বাবুদের আড্ডা, সুতরাং সেটীকে কি নামে অভিহিত করা যায় ভাবিয়া পাইতেছি না। বড়দিদি কিন্তু পাশের বাড়ীটীর নাম রাখিয়াছিলেন "মুক্তিমণ্ডপ"।

মেসের বাবুদের জ্বালায় আমাদিগকে অতিষ্ঠ হইতে হইয়াছিল। আমি তখন ছেলেমানুষ। আমি আর কি বুঝি; আমি মনের আনন্দে ছাতে খেলা করিয়া বেড়াইতাম; দিদিকে কতদিন ছাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তিনি যাইতেন না। যখন অনেক দিন পরে তিনি ঐ মেসের বাড়ীর গল্প করিয়াছিলেন, তখন আমি সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কলিকাতায় বাড়ী, পুরুষ অভিভাবক নাই। বাড়ীতে দিদি আর আমি। দিদির বয়স তখন আঠারো বৎসর। দিদি যে পরমা সুন্দরী ছিলেন—তাহা না বলিলেও চলে। এ অবস্থায় পাশের বাড়ীর সেই মুক্তিমণ্ডপ আমাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

আমাদের একজন চাকর ছিল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ আমার বাবার আমলের চাকর। সে আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় নাই। বাহিরের যাহা কিছু দরকার, সমস্তই রামকৃষ্ণ নির্ব্বাহ করিত। সে প্রত্যহ আমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইত, আমার সহস্র আবদার সে দিদির সহিত ভাগ করিয়া বহন করিত।

একদিন দিদি রামকৃষ্ণকে বলিলেন যে, আমাদের এই বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে। রামকৃষ্ণ ত কথা শুনিয়াই অবাক্! দিদির নিকট

শুনিয়াছি, বুড়া রামকৃষ্ণ এই প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। পৈত্রিক বাড়ী, কি দুঃখে ছাড়িব! দিদি রামকৃষ্ণকে তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার নিকট যেদিন প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিলেন, সেদিন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, দিদি কেন পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

মেসের বাড়ীতে তের চৌদ্দ জন বাবু থাকিতেন; সকলেই নানা আফিসে কাজ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিক বয়সের কেহই ছিলেন না। বোধ হয় মুক্তিমণ্ডপের আনন্দের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়াই একদল নব্য বাবু মেস করিয়াছিলেন।

পাশের বাড়ী; ইচ্ছা করি আর নাই করি, সে বাড়ীর লোকের গতিবিধি সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হইবেই হইবে। গৃহস্থের বাড়ী হইলেও কথা ছিল; আফিসের বাবুদিগের মেস, সন্ধ্যার পর যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়িত; অথবা হঠাৎ কেহ দেখিলে মনে করিত, যাত্রা বা থিয়েটারের আড্ডা। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঘরে-ঘরে আমোদ-আহ্লাদ, ছাতে জটলা লাগিয়াই থাকিত।

এতগুলি বাবুর মধ্যে একটি বাবুকে বেশ একটু সভ্য বলিয়া দিদির মনে হইত। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ঐ দলের মধ্যে ঐ বাবুটী একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। তিনি কোন আমোদ-আনন্দে যোগদান করিতেন না; মেসের অন্যান্য সকলে যখন নীচের ঘরে হল্লা জুড়িয়া দিত, বাবুটি তখন ধীরে ধীরে ছাতে আসিতেন এবং অতি বিষণ্ণবদনে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। দিদির মুখে শুনিয়াছি, তিনি কোন দিনও আমাদের বাড়ীর দিকেও চাহিতেন না।

এই বাবুটীকে দেখিয়া দিদির মনে কেমন একটা করুণার সঞ্চার হইয়াছিল। দিদি মনে করিতেন, বাবুটীর বোধ হয় অবস্থা ভাল নহে, কলিকাতায় হয় ত অতি অল্প বেতনে চাকুরী করেন। তাঁহার আয়ের দ্বারা হয় ত তাঁহার বৃহৎ পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। সেই জন্যই হয় ত বাবুটী এই প্রকার বিষণ্ণভাবে সময় অতিবাহিত করেন।

স্নেহময়ী, করুণাময়া হিন্দু-বিধবা পরের দুঃখে গলিয়া যান, পরের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারিলে কৃতার্থা হন। দিদিরও ঐ বাবুটীর উপর করুণার সঞ্চার হইয়াছিল। দিদি প্রায়ই অবসর-সময়ে বাবুটীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। দিদির এই ভাব বাবুটীও অতি অল্প দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা।

দিদির মুখের দিকে চাহিয়া যে কাহারও প্রাণে কুভাবের সঞ্চার হইতে পারে, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু ঐ বাবুটীর স্কন্ধে অপদেবতা ভর করিয়াছিল; নতুবা যে দিদির করুণা-পূর্ণ পবিত্র মুখশ্রী দেখিলে মানুষের মস্তক ভক্তিভরে অবনত হয়, সেই দিদিকে তিনি অপবিত্র চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন দিদি হয় ত তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। হায় অন্ধ!

দিদি কিন্তু এ ভাব মোটেই বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি পূর্ব্বের মতই ছাতে যাইতেন, বাবুটীর দিকেও অন্যের অলক্ষ্যে চাহি-তেন। দিদির মুখে শুনিয়াছি যে, এক-এক সময় তাঁহার ইচ্ছা হইত রামকৃষ্ণকে পাঠাইয়া বাবুটীর খোঁজ লইবেন, তাঁহার যদি কোন অভাব থাকে, তাহার পরিপূরণের চেষ্টা করিবেন। সৌভাগ্যক্রমে রামকৃষ্ণকে

এ কার্য্যে প্রেরণ করিবার সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দিদির ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দিদি কি জন্য ছাতে গিয়াছেন, এমন সময় ঐ বাবুটীও তাঁহাদের ছাতে উঠিলেন। দিদিকে একাকিনী ছাতে দেখিয়া বাবুটী একটা মোড়ক আমাদের বাড়ীর ছাতে ফেলিয়া দিলেন। দিদি কিন্তু তখন তাহা দেখিতে পান নাই। বাবুটী যখন দেখিলেন দিদি সে মোড়কটা কুড়াইয়া লইলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন, দিদি হয়, উহা লক্ষ্য করেন নাই। বাবুটী তখন সহাস্যমুখে বলিলেন "ঐ চিঠি!"

দিদি এই কথা শুনিয়াই বাবুটীর দিকে চাহিলেন। তিনি তখন আরও সাহস পাইলেন, তিনি বলিলেন "রাত্রি আটটার সময় ছাতে থাকিব; সেই সময় উত্তর চাই।" এই কথা শুনিয়া দিদির আপাদ-মস্তক ঘুরিয়া গেল; তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না; কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া না-প ড়য়াই শত খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং বাবুটীর দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। তাহার পর এতকাল চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনও দিদি ছাতে উঠেন নাই। যেদিন দিদি এই ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেন, সেই দিন আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

এই গল্পের উপসংহার-কালে দিদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার এক-একবার মনে হইতে লাগিল রামকৃষ্ণকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলি; সে লোকটাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়া আসুক। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহার

অপরাধ কি ? অপরাধ ত আমারই। আমার ব্যবহার যদি সে কুভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার হৃদয়ের নীচতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাকে অপরাধী বলা যায় না। আমিই অন্যায় কাজ করিয়া-ছিলাম—আমার ব্যবহার সঙ্গত হয় নাই। তাহার দুই দিন পরে প্রাতঃকালে সাতটায় সময় দেখি পুলিশের দারোগা ও কয়েকজন কনেষ্টবল ঐ মেসের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কলিকাতা-সহরে এ প্রকার ব্যাপার ঘটিলে দেখিতে-দেখিতে রাস্তায় লোক জমিয়া যায়। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য রামকৃষ্ণও ঐ বাড়ার দ্বারে গেল ; আমিও জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটু পরেই দেখি, কনষ্টেবলেরা সেই বাবুটীর হাতে হাতকড়া লাগাইয়া বাড়ীর বাহির করিল। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটু পরেইরামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল 'ঐ যে বাবুটীকে ধ'রে নিয়ে গেল, ও কা'ল রাত্রিতে কোন কুস্থানে যাইয়া অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল। অলঙ্কার-শুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। আহা, ভদ্রলোকের ছেলে! ওর এ দুর্ম্মতি হোলো কেন ? বাবুটীকে কিন্তু বড় ভাল বলিয়া আমাদের মনে হইত ' আমি মনে মনে বলিলাম, আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম।"

দিদি এই গল্পটা কি মনে করিয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এই গল্পটী শুনিবার পর হইতে আমি দিদিকে স্বর্গের দেবী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আর বুঝিয়াছিলাম বঙ্গ রমণী, বঙ্গ-বিধবার হৃদয় কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত! এই মহিমময়ী স্বর্গের দেবীদিগের সম্মুখে যে পাপ-প্রলোভন উপস্থিত করে, তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে, হে ইন্দ্র! তাহাদিগের মস্তকে তোমার বজ্র পতিত হয় না কেন ?

অন্তিম প্রার্থনা

তিন দিনের জ্বরে, বিনা চিকিৎসায় ভবতারণ সরকার ৬৫ বৎসর বয়সে কোন্ এক অজানা দেশে চলিয়া গেলেন। রেজেষ্টরী অফিসের কেরাণীগিরি, প্রিয়তমা গৃহিণী, আদরিণী কন্যা, কেহই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবারও সময় পাওয়া গেল না; সামান্য জ্বরে কে আবার ডাক্তার ডাকে? প্রথম দিন যখন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না, তখন তাহার গৃহিণী বলিলেন, "একবার হরিশকে ডাকিয়া দেখাইলে হয় না?"

ভবতারণ বলিল, "সামান্য একটু জ্বর, তা আবার ডাক্তার ডেকে কি হবে? দুই দিন লঙ্ঘন দিলেই সেরে যাবে।" গৃহিণী তাহাই বুঝিলেন।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে জ্বর বাড়িয়া উঠিল। কোন রকমে রাত্রি কাটিয়া গেল। গ্রামে হরিশ মিত্র ছাড়া ডাক্তার বা কবিরাজ ছিল না। ভবতারণের গৃহিণী প্রাতঃকালে মিত্রদের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে শুনিলেন, পূর্ব্ব রাত্রিতে হরিশ কলিকাতায় গিয়াছে, সেইদিন অপরাহ্ণ-কালেই বাড়ী আসিবে। ভবতারণের স্ত্রী কি করিবেন, অপরাহ্ণ-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই স্থির করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার তিনি মিত্রদিগের বাড়ীতে গেলেন, হরিশ তখনও ফেরে নাই। বাড়ীর লোকেরা বলিল, হরিশ এলেই পাঠাইয়া দিবে। সুলোচনা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে জ্বর আরও বাড়িল; হরিশের বাড়ীতে কন্যা

মোহিনীকে পাঠাইয়া দিয়া সুলোচনা পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হরিশ কাকা এখনও আসে নাই।"

এদিকে জ্বরের সঙ্গে প্রলাপ আরম্ভ হইল। সুলোচনা কি করিবে? প্রতিবেশী রায়মহাশয়কে সংবাদ দিলেন। রায়মহাশয় আসিয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তাই ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে জ্বরটা কেমন বেরোখা হোয়ে পড়েছে। তাই ত! তা, ভয় নেই, মাথায় ঠাণ্ডা জল দিতে থাক।"

মোহিনী বলিল, "জেঠামশাই, আপনি একটু বসুন, আমাদের বড় ভয় হচ্চে।"

রায়মহাশয় কি করিবেন, বাহিরে বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই পরেই মোহিনী তাড়াতাড়ি ডাকিল, "জেঠামশাই, একবার দেখুন, বাবা যে কেমন করেন।"

রায়মহাশয় ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, ভবতারণ অন্তিম শ্বাস টানিতেছে। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। সময়মত বাহিরে আনাও হইল না, অন্তর্জ্জলি করাও হইল না। অনাথা বিধবা ও কন্যার ক্রন্দনে পাষাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

পাড়ার মেয়েরা আসিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় মৃতদেহের সৎকার করিবার আয়োজন করিতে গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা বাসিমড়া না করিয়া রাত্রিতেই দাহকার্য্য শেষ করিবেন। কিন্তু প্রতিবেশী কেহই সম্মত হইল না। ভবতারণ যদি অবস্থাপন্ন লোক হইত, তাহা হইলে হয় ত লোকের অভাব হইত না; কিন্তু সে রেজেষ্ট্রী আফিসের সামান্য কেরাণী, দিন আনিত, দিন খাইত, কোন কোন

দিন তাহার অর্দ্ধাশনেও কাটিয়া যাইত। এমন দরিদ্র লোকের শব দাহ করিবার জন্য এই রাত্রিতে গ্রামের লোক কেহ অগ্রসর হইল না। পরদিন অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া রায় মহাশয় কয়েকটী লোক সংগ্রহ করিলেন। যথারীতি ভবতারণের শব-দেহ শ্মশানে ছাই করা হইল। সকলে হরিবোল দিয়া ঘরে ফিরিল।

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবতারণ রেজেষ্টরী আফিসের কেরাণীগিরি করিত। রেজেষ্টরী আফিসে বেতন কম হইলেও দুপয়সা পাওনা আছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ভবতারণ লোকটা নিতান্তই বোকা; তাহার বিষয়বুদ্ধি মোটেই ছিল না। কেমন করিয়া বলিতে পারি না, তাহার মাথার মধ্যে এই কথা প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল যে, বেতনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা অপরাধ, তাহাতে পাপ হয়। এই পাপের ভয়ে বোকা ভবতারণ মাসিক ১২ টাকা বেতনেই অতি কষ্টে সংসার চালাইত।

সংসারেও বড় বেশী লোক ছিল না। ভবতারণ নিজে, তাহার স্ত্রী ও একটী কন্যা। বাড়ীতে একটী ঝিও ছিল না। গরিব মানুষ, চাকর বা দাসী রাখিবার মত অবস্থা নয়। ভবতারণ নিজেই হাটবাজার করিত; তাহার স্ত্রী সুলোচনা ও কন্যা মোহিনী গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করিত।

ভবতারণের মৃত্যুর পরদিন প্রতিবেশী রায়মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহিনী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "জেঠা মশাই, মা জিজ্ঞাসা কোরছেন, এখন আমাদের কি উপায় হবে?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "সেই কথাই ত ভাব্‌ছি মা। ভবতারণকে

কতদিন বোলেছি যে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাব্‌তে হয়, দুপয়সা গোছাতে হয়। তা, তার যে মাথায় কি খেয়াল ঢুকেছিল, সে কিছুতেই অন্য রকমে একটি পয়সা উপার্জ্জন কোরতে চাইত না। রেজেষ্টরী আফিসের কাজ, দেখে-শুনে করতে পার্‌লে, চাই কি আজ সে বিলক্ষণ দশ-টাকা রেখে যেতে পারতো। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর, কিছু হাতে আছে কি না ?"

মোহিনী ঘরের মধ্যে যাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিল, "জেঠামশাই, মা বোল্লেন তাঁর কাছে একটাকা তের আনা পয়সা আছে। তা ছাড়া আফিসে মাইনের টাকা কিছু পাওনা থাকতে পারে। আর ত কিছু নেই।"

রায়মহাশয় তখন বড়ই চিন্তায় পড়িলেন; এই অনাথা বিধবাকে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "মা, ভেবো না। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি. এক কাজ কর, কাল ত তোমাদের মুখে ভাতও ওঠে নাই। আজ হবিষ্যের ত আয়োজন কোর্‌তে হবে। সে জন্য ভাবনা নেই, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর যা হয় দেখা যাবে। ভগবানের রাজ্যে কি লোকে না খেয়ে মারা যায় ?"

এই বলিয়া রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন। সুলোচনা তখন বাহিরে আসিয়া মেয়েটাকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইলেন। তাহার আর কাঁদিবার শক্তি ছিল না, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুইটা অন্নের জন্য মেয়েটার হাত ধরিয়া পথে-পথে ভিক্ষা করিতে হইবে। আর ত কোন উপায় নাই।

সুলোচনা সারাদিন জলটুকুও খাইলেন না। রায় মহাশয়দের

বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া কত বলিলেন, কত প্রবোধ দিলেন, কিন্তু সুলোচনা কোন মতেই জলটুকুও খাইতে চাহিলেন না। তাঁহারা তখন মোহিনীকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেক কষ্টে তাহাকে কিছু আহার করাইলেন। মোহিনী আহারান্তে বাড়ীতে আসিয়া দেখে, তাহার মা শয়ন করিয়া আছেন। মোহিনী ডাকিল "মা।"

সুলোচনা কোন উত্তর দিলেন না। মোহিনী মনে করিল, তাহার মা বুঝি ঘুমাইয়াছেন। সে তখন মায়ের পাশ বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা চাহিয়া দেখিলেন, মোহিনী তাঁহার পাশে বসিয়া আছে। তিনি তখন অতি কষ্টে মৃদুস্বরে বলিলেন "মা, তোমার জেঠাই-মাকে একবার ডেকে আন্‌তে পার?"

মোহিনী বলিল "মা, তুমি অমন কোর্‌ছো কেন?"

সুলোচনা বলিলেন "মা, আমার বুকটা যেন কেমন কোর্‌ছে, আমি কথা বোল্‌তে পার্‌ছি না। তুমি একটু শীঘ্র কোরে তোমার জেঠাই-মাকে ডেকে নিয়ে এস।"

মোহিনী তাড়াতাড়ি রায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে গেল এবং রায়গিন্নিকে দেখিয়া বলিল "জেঠাই মা, শীঘ্র এসো, মা তোমাকে ডাক্‌ছেন। মা কথা বোল্‌তে পার্‌ছেন না। আমার বড় ভয় হয়েছে।"

মোহিনীর কথা শুনিয়া রায়-বাড়ীর মেয়েরা সকলে তাড়াতাড়ি আসিলেন; রায়মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন সুলোচনার দুই চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছে, তারকাদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, শরীর বরফের মত শীতল।

রায়-গিন্নী তখন সুলোচনাকে ডাকিয়া বলিলেন "ও বৌ,

তোর কি হয়েছে। অমন করছিস কেন? কথা বোল্‌তে পারছিস্‌ না কেন?"

সুলোচনার তখন জ্ঞান হইল। তিনি দেখিলেন রায়-বাড়ীর মেয়েরা সকলে আসিয়াছেন। তিনি রায়-গিন্নীকে তাহার কাছে বসিবার জন্য হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিলেন। রায়-গিন্নী তখন সুলোচনার কাছে বসিলেন। সুলোচনা কি বলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া রায়-গিন্নী বলিলেন "ওরে, তোরা একজন শীগিগর যা, হরিশকে ডেকে নিয়ে আয়। মণি, কর্ত্তাকে খবর দে। তারা, তুই দৌড়ে আমাদের বাড়ী থেকে একটু গঙ্গাজল নিয়ে আয় ত। মুখে একটু গঙ্গাজল দিই।"

মোহিনী বলিল "ঘরেই গঙ্গাজল আছে।" এই বলিয়া সে ঘরের মধ্য হইতে গঙ্গাজলের ঘটী বাহির করিয়া দিল। রায়-গিন্নী বলিলেন "গঙ্গাজল, একটু খা।" সুলোচনা অতি কষ্টে গঙ্গাজল খাইলেন। তাহার পর তাঁহার শরীর যেন একটু ভাল বোধ হইল, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি মোহিনাকে নিকটে ডাকিলেন। মোহিনী তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুলোচনা বলিলেন "কাঁদিস্‌নে মা, কাঁদিস্‌নে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারলাম না" এই বলিয়াই আবার চুপ করিলেন।

রায়-গিন্নী তখন সুলোচনার মুখে আর একটু গঙ্গাজল দিয়া বলিলেন "ও কি কথা বৌ! তোর কি হয়েছে। অমন করছিস্‌ কেন? মেয়েটা কেঁদে খুন হলো যে!"

সুলোচনা তখন রায়-গিন্নীর হাতখানি ব্যাকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন ; রায়-গিন্নী বুঝিতে পারিলেন, সুলোচনা যেন তাঁহাকে কি বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিলেন "বৌ, অমন করছিস্ কেন ? কি বল্‌বি বল্ ?"

সুলোচনা ধীরে ধীরে বলিলেন "দিদি, আমার আর সময় নাই। আমার সব শেষ হয়ে এসেছে। যাঁর জন্য সংসার, তিনি আমায় রেখে চোলে গেলেন। আমি কি আর থাকতে পারি। কিন্তু ভাবনা এই মেয়েটীর জন্যে। এর কি হবে দিদি ! সংসারে যে এর কেউ নেই।" সুলোচনা আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রায়-গিন্নী ও অন্যান্য সকলের চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইল ; কাহারও মুখ দিয়া কথা সরিল না।

সুলোচনা একটু অশ্রু-সংবরণ করিয়া বলিলেন "দিদি, তোমার কাছে একটা প্রার্থনা। আমার কাছে যদি সত্য কর, তবে বলি।"

রায়-গিন্নী বলিলেন "কি কথা বৌ, বল্ না। এত ভাবছিস্ কেন ? তোর মনের কথা কি ?"

সুলোচনা বলিলেন "দিদি, আমার কাছে আগে সত্য কর, আমি যা বোল্‌বো তা তুমি কোর্‌বে, তবে বলি ; নতুবা মনেই থাকুক। দিদি ! আর আমার সময় নাই।"

সুলোচনার ব্যাকুলতা দেখিয়া রায়-গিন্নীর প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; বলিলেন "বৌ, তুই ভাবছিস্ কেন ? বল্ তোর মনের কথা কি ; আমি সত্য কোরছি তুই যা বোল্‌বি আমি তাই কোরবো।"

তখন সুলোচনার মলিন মুখে হাসির রেখাপাত হইল, তাঁহার চক্ষু

দুইটী আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাঁহার জীবনীশক্তি যেন ক্ষণকালের জন্য ফি'রয়া আসিল। তিনি বলিলেন "দিদি, কি বলব। আজ আমার মরিয়াও সুখ। আমার শেষ অনুরোধ, এই অভাগিনী মেয়েটাকে তোমার ছেলে সুবোধের সঙ্গে বিয়ে দিও দিদি, আমার এই প্রার্থনা। বল দিদি, তুমি আমার এই অনুরোধ রক্ষা কোরবে। বল, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর কাছে চোলে যাই।"

রায়-গিন্নী একটুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া বলিলেন "দেখ্‌ বৌ, তোর মত সতী-লক্ষ্মীর মেয়েকে মাথায় কোরে ঘরে তুলে নেবো। তোব কাছে শপথ কোর্‌ছি, মোহিনীর সঙ্গে আমার সুবোধের বিয়ে দেবো।"

রায়-গিন্নী আর কথা বলিতে পারিলেন না। সুলোচনার সহাস্য বদন দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে আবার কালিমার সঞ্চার হইল, ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনস্রোত মন্দীভূত হইতে লাগিল। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া সেই সতীর দেহ বাহিবে লইয়া আসিলেন। তাহার পরই সব শেষ!

সেই রাত্রিতে গৃহিণীর মুখে রায় মহাশয় সমস্ত কথা শুনিলেন। বৃদ্ধ রায় মহাশয় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন "দেখ, আজ আমি যে আনন্দলাভ করিলাম, জাবনে কোন দিন এমন আনন্দ আমি ভোগ করি নাই। তুমি উপযুক্ত কাজহ কোরেছ। এমন সতীলক্ষ্মীর মেয়েকে সত্যসত্যই আমি মাথায় কোরে ঘরে তুল্‌বো। কলিকালে যে এমন সতী থাক্‌তে পারে, তা আমি জান্‌তাম না। যদি কেউ আমাকে লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে সুবোধেব বিয়ে দিতে চাইত, তা হোলেও আমি তাতে সম্মত হোতাম না। তুমি স্ত্রীর উপযুক্ত কাজই কোরেছ। তোমার শপথ আমির্ রক্ষা কোত্তে বাধ্য।"

তারপর যথাসময়ে মহা আড়ম্বর করিয়া রায়-মহাশয় পিতৃ-মাতৃহীনা মোহিনীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র সুবোধের বিবাহ দিলেন। মোহিনী মায়ের মৃত্যুকালের সেই প্রসন্ন বদন যখন-তখনই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইত, আর তাহার প্রাণে শান্তিধারা বর্ষিত হইত।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের পুস্তকাবলী

১।	হিমালয়—(৫ম সংস্করণ)	১।০
২।	প্রবাস চিত্র—(৩য় সংস্করণ)	১৲
৩।	পথিক—(২য় সংস্করণ)	১৲
৪।	নৈবেদ্য—(২য় সংস্করণ)	॥০
৫।	কাঙ্গাল হরিনাথ—(১ম খণ্ড)	১।০
৬।	করিমসেখ—(২য় সংস্করণ)	৸০
৭।	ছোট কাকী—(২য় সংস্করণ)	৸০
৮।	নূতন গিন্নী—(২য় সংস্করণ)	৸০
৯।	দুঃখিনী —(২য় সংস্করণ)	৸০
১০।	পুরাতন পঞ্জিকা—	১৲
১১।	বিশুদাদা—(তৃতীয় সংস্করণ)	১॥০
১২।	সীতাদেবী—(৩য় সংস্করণ)	১৲
১৩।	হিমাদ্রি	৸০
১৪।	কাঙ্গাল হরিনাথ—(২য় খণ্ড)	১।০
১৫।	পরাণ মণ্ডল—(২য় সংস্করণ)	১।০
১৬।	আমার বর—(২য় সংস্করণ)	১।০
১৭।	কিশোর—(২য় সংস্করণ)	১৲
১৮।	দশদিন	১।০
১৯।	আশীর্ব্বাদ—(২য় সংস্করণ)	১।০
২০।	বড়বাড়ী—(৫ম সংস্করণ)	।০
২১।	ঈশানী	১॥০
২২।	পাগল	১॥০
২৩।	চোখের জল	১॥০
২৪।	হরিশ ভাণ্ডারী—(৩য় সংস্করণ)	॥০
২৫।	কাঙ্গালের ঠাকুর	॥০
২৬।	যোল আনি	১॥০
২৭।	অভাগী—(৬ষ্ঠ সংস্করণ)	॥০

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স;
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।